রাশিয়ার রূপকথা

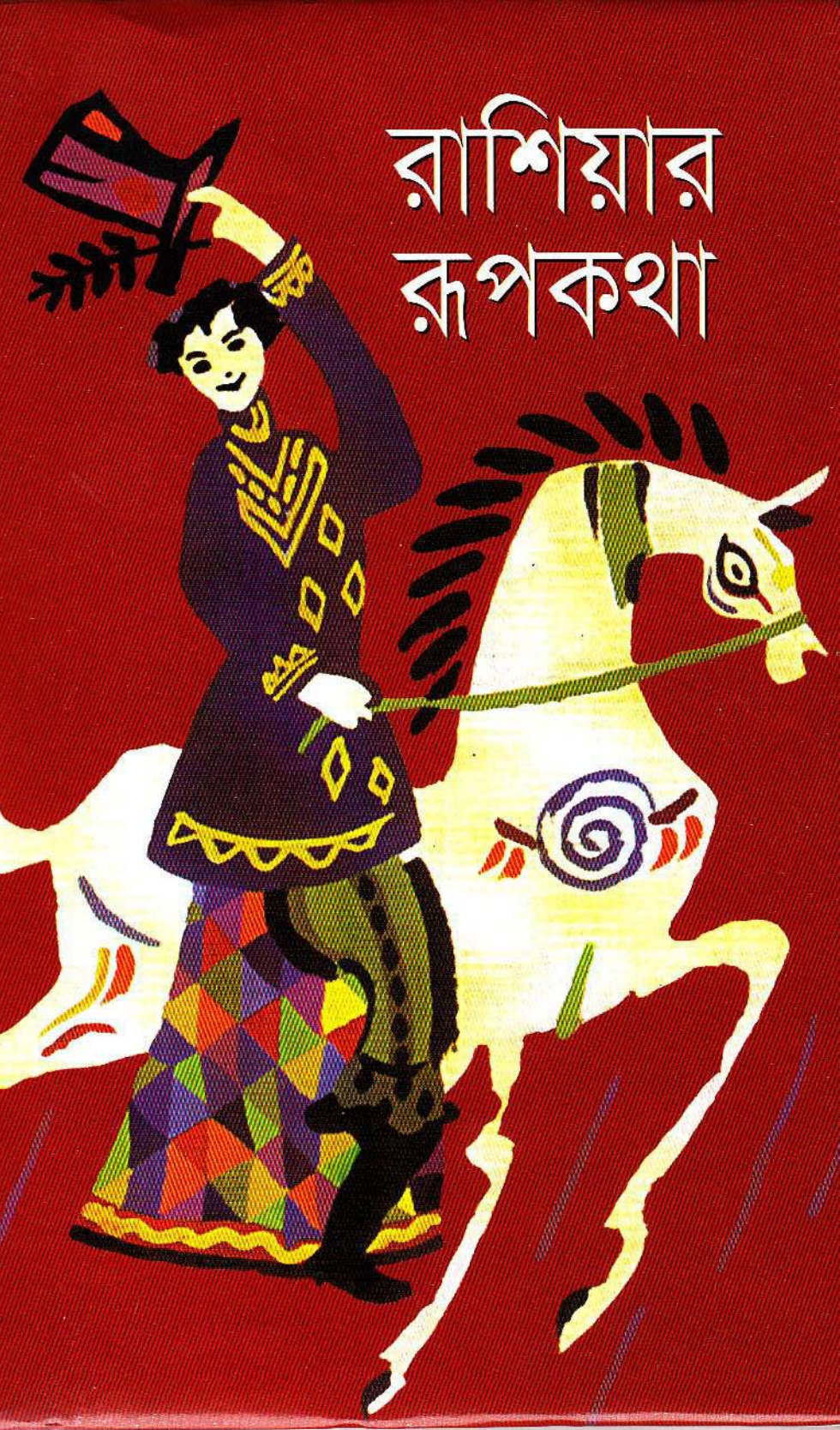

চিরায়ত গ্রন্থমালা

রাশিয়ার রূপকথা

আলোকিত মানুষ চাই

রাশিয়ার রূপকথা

সম্পাদনা ॥ আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
795941

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

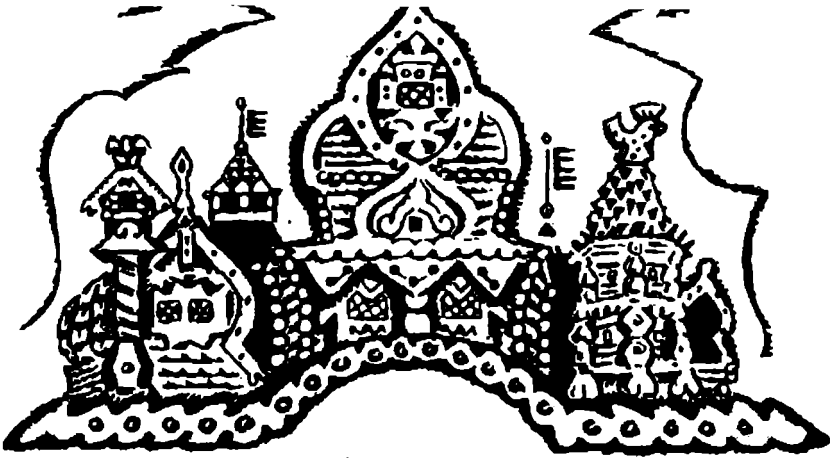

রূপকথা ও রাশিয়ার রূপকথা প্রসঙ্গে

রূপকথা কী সে-কথা বলবার আগে লোককথা কী সে-সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ লোককথা, রূপকথা, ফেইরি টেল, উপকথা ইত্যাদি আঙ্গিকগুলো সচরাচর একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার অবশ্য কিছু জোরালো কারণও আছে। এইসব আঙ্গিকগুলোর পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে সাধারণভাবে একে গ্রাহ্য করা হয় না। এর কারণ এই সবগুলোরই উদ্ভবের বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া একই—মানুষের প্রবৃত্তির তাড়না। গল্প শুনবার আগ্রহ মানুষের সহজাত চিরন্তন প্রবৃত্তি। এই তাড়নাই এইসব আঙ্গিকের উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়া।

শ্রুতি-পরম্পরায় যে-সব বিষয়বস্তু অতীত কাল থেকে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে সে-সব বিষয়বস্তুই লোককথার উপকরণ। কতগুলো অপ্রচলিত ও আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ এতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এ-সব উপকরণে থাকে একটি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন আবেদন। আর এ আবেদনের গুণেই তা কালকে জয় করতে সক্ষম হয়। তবে এতে থাকতে পারে রসের বৈচিত্র্য। কোনো কোনো লোককথা অতিরিক্ত রোমান্সধর্মী, কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে এর স্বাধীন বিহার। কোনো কোনো লোককথায় কল্পনার এত উদ্দাম বিস্তৃতি নেই, সে-সব কাহিনী পড়লে মনে হবে যেন আমরা আমাদেরই সুখ-দুঃখের বা আশা-নিরাশার কাহিনী পাঠ করছি। কতগুলোর ভেতর দিয়ে জীবনের ছোটখাটো অসঙ্গতি ও দোষত্রুটি কৌতুকের স্পর্শ পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিছু কিছু লোককথা রচিত হয় নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে। লোককথার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর প্রাণশক্তি অপরিসীম, অবশ্য কেবল লোককথা সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। কারণ এরা যে কেবল শত শত এমনকি হাজার বছর ধরে সমাজের মধ্যে বেঁচে আছে তা নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো কোনো লোককথা সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই প্রচলিত হয়ে আছে। এইসব বিচিত্র লোককথার প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের মাঝ বরাবর যে সবসময় সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা যায় তা নয়। আর সে-কারণেই নানা জন নানা নামে এগুলোকে অভিহিত করেন। কিন্তু আধুনিক তত্ত্ববাগীশেরা পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে ভেদরেখা টেনে বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা কেবল লোককথার মধ্যে রূপকথাগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করব। কারণ আমাদের এই সংকলনের উদ্দেশ্য রুশ জাতির লোককথাগুলোর মধ্য থেকে কেবল রূপকথাগুলোকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা। সুতরাং কোন ধরনের লোককথা রূপকথা-গুণসম্পন্ন সে-সম্পর্কে আগে আলোকপাত করা যেতে পারে।

প্রায় সকল জাতির মধ্যেই এক ধরনের লোককথার প্রচলন আছে ইংরেজি পরিভাষায় যার নাম Fairy tale। কিন্তু ইংরেজি এই পরিভাষাটির দ্বারা এই ধরনের লোককথার পরিচয় বিশদভাবে প্রকাশ পায় না। তার কারণ Fairy শব্দটির অর্থ পরী। এই ধরনের সব গল্পেই পরীর কথা থাকে না। এই ধরনের গল্পের পরিবেশটি হয় সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল— সুনির্দিষ্ট কোনো স্থান ও সুস্পষ্ট কোনো চরিত্র অবলম্বন করে রচিত হয় না। অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনার দ্বারা এ-সব গল্প পরিপূর্ণ। সাধারণত এর নায়ক কোনো অপরিচিত দেশের রাজপুত্র। এক নতুন অপরিচিত দেশে প্রবেশ করে অসম্ভব বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিণতিতে রাজকন্যাকে বিয়ে করে সিংহাসন অধিকার করে। এই ধরনের লোককথার একটা জুতসই জার্মান পরিভাষা আছে। জার্মান ভাষায় এ-ধরনের লোককথার নাম marchen। পণ্ডিতদের ভাষ্য অনুসারে ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর মধ্যে এই শব্দটির দ্বারা ঐ ধরনের লোককথার পরিচয় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বাংলা পরিভাষায় এর নামই রূপকথা। তবে এককথায় বলা যায় যে সেই লোককথাই রূপকথা যা সর্বদাই রূপকাশ্রিত। সে-কারণেও এই ধরনের লোককথার 'রূপকথা' নাম সার্থক।

রূপকথা যে-সব অভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা রচিত হয়ে থাকে তা কোনো দেশেরই একান্ত সম্পদ নয়; এর আছে সর্বজনীন ভিত্তি। রূপকথার বিষয়বস্তুতে থাকে দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ আবেদন। সুগভীর জীবনবোধ এ-সবের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। ফলে রূপকথার মূল উদ্দেশ্যসমূহ সকল দেশের সমাজের ওপরই প্রযোজ্য। সে-কারণে দেশ-দেশান্তরে এ-সবের প্রচার লাভ করতে কোনো বাধা ঘটে না। তবে রূপকথার পরিবেশ প্রত্যেক সমাজই যথাসম্ভব নিজের মতো করে গড়ে নেয়। আর সে কারণেই একই গল্পের ভিন্ন পাঠ অন্য দেশে পাওয়া যায়।

লোককথার কোনো জাতি নেই, ধর্ম নেই। খ্রিস্টানের বা ইহুদির লোককথা বলে কিছু নেই, হিন্দুর বা মুসলমানের লোককথা বলে কিছু নেই। জাতি বা ন্যাশনালিটির দ্বারা এর পরিচয়, ধর্ম দ্বারা নয়। যেমন বাঙালির লোককথা বা রুশিদের লোককথা বা জার্মানদের লোককথা ইত্যাদি। লোককথার কোনো অংশেই কোনো ধর্মের প্রবল প্রভাব থাকে না বলে দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করতে কোনো বাধা থাকে না। রূপকথার এমন এমন রূপক বা সঙ্কেত থাকে যা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মনকে স্পর্শ করে। এর ফলে আমাদের মধ্যে যে আনন্দের সঞ্চার ঘটে সব সময় তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দের কারণ আমাদের সচেতন মন খুঁজে না পেলেও অবচেতন মন টের পায়। সেজন্যই পরিণত মন রূপকথা বর্ণনা করতে আনন্দ পায়। রূপকথার গল্পের বর্ণনাকারী হয়ে থাকেন সাধারণত দাদি-নানিরা অর্থাৎ বড়রা। আপাত দৃষ্টিতে লোককথা বা রূপকথা শিশুমনোরঞ্জনের জন্য রচিত বলে মনে হলেও অপরিণত মনের সৃষ্টি নয়। পরিণত মন তার নিজের আনন্দের জন্যই এর সৃষ্টি করেছে, লালন করে বাঁচিয়ে রেখেছে, যুগে যুগে এর শরীরে বর্ণবৈচিত্র্য যোগ করেছে। শিশুর ভূমিকা এখানে কেবল কৌতূহলী শ্রোতার। সুতরাং লোককথা বা রূপকথা শিশুসাহিত্য নয়, পরিণত মনের সাহিত্য। পার্থক্য শুধু এই যে পরিণত মনের কথা এখানে উপস্থাপিত হয় শিশুমনের জগতের ভেতর দিয়ে।

রূপকথার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে এতে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রাধান্য দেখা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের পরিপার্শ্বের অনেক রহস্যেরই ব্যাখ্যা দিয়ে রহস্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে সাম্প্রতিককালে পরিণত মনের কাছে রূপকথার ঐন্দ্রজালিকতা আর

আকর্ষণীয় মনে হয় না। ফলে আধুনিক কালে প্রধানত রূপকথাগুলো শিশুদের কাছেই আদৃত হচ্ছে। সে-কারণে রূপকথা এখন কেবল শিশুসাহিত্যের অংশ হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে।

রূপকথা হচ্ছে সেই ধরনের লোকায়ত আখ্যান বা কাহিনী যা মানবজীবনেরই রূপক। এই রূপক মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এবং তার গভীরতম সত্যকে প্রকাশ করে। রূপকথা এমন এক মাধুর্যময় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে যা মানব হৃদয়ের 'গোপন কক্ষে' গিয়ে 'আঘাত করে' এবং সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলোর মধ্যে একটি 'সাড়া' জাগিয়ে দেয়। রূপকথার পৃথিবীতে রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এক পলকে চলে যায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে। এখানে পক্ষীরাজ দেখা দেয় দ্রুতযানের প্রতীক হয়ে; রূপকথার বিশ্বে অবলীলায় কথা বলে চাঁদ-সূর্য, পশু-পক্ষী; তারা হয়ে ওঠে মানুষের প্রতীক। সাধারণভাবে দৈত্য-দানব, রাক্ষস-খোক্কস ইত্যাদি যেমন হয়ে ওঠে অশুভের ও ধ্বংসকারী শক্তির প্রতীক তেমনি রাজপুত্র হয়ে থাকে শুভ ও কল্যাণের প্রতীক।

এতক্ষণ যে রূপকথার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হল তার নাম দেয়া যায় লোকায়ত রূপকথা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই লোকায়ত রূপকথা থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত আখ্যানে আধুনিক মানুষের জীবন সংকটের যে রূপক সৃষ্টি করা হয় সেগুলোর নাম দেয়া যায় আধুনিক রূপকথা। *রাশিয়ার রূপকথা* বইয়ে কেবল রাশিয়ার লোকায়ত রূপকথাগুলোই সংকলিত হয়েছে। ফলে এর গল্পগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে রুশিদের আবহমানের জীবনচিত্র, তাদের ভৌগোলিক অবস্থার পরিচয়, তাদের আবহাওয়ার ধরন, তাদের মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। এইসব রূপকথার কথকদের কারো কারো বাস ছিল বিস্তীর্ণ স্তেপ অঞ্চলে, সুউচ্চ পাহাড়ে; কারো বা বাস দুরন্ত নদীর পাড়ে, কারো বা গহন বনে। রুশিরা ঘরোয়া গল্প আর চুটকি ভালোবাসে। তাদের রূপকথায় এ-সবেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। যে-সময়ে রাশিয়ায় রূপকথার জন্ম সে-সময়ে সামন্ত মালিকেরা তাদের দাস-দাসীদের দিয়ে যা খুশি করাতে পারত। যেমন, তাদের বিক্রি করতে পারত, সৈনিক হিসাবে তাদের দিয়ে যুদ্ধ করাতে পারত। এমনকি বদল করতে পারত শিকারি দলের সঙ্গেও। এ-সবের বিরুদ্ধে দাস-দাসীদের বা গরিব চাষিদের প্রতিরোধের চিত্রও উঠে এসেছে কোনো কোনো রূপকথায়। ফলে গল্পগুলোতে মাঝে মাঝেই দেখা যায় গরিব চাষিরা বা সৈন্যদের সবসময় তাদের নিষ্ঠুর প্রভু আর তার খামখেয়ালি স্ত্রীকে জব্দ করার চেষ্টা করছে।

প্রাচীন রুশিদের মধ্যে এক ধরনের মহাকাব্যের প্রচলন ছিল যার নাম বিলিনা। ধীর গতির ছন্দে এগুলো রচিত। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের লোকেরা এগুলো গেয়ে বেড়াত। বিলিনায় আছে রুশি সেইসব বীরদের কথা যারা তাদের -মাতৃভূমিকে রক্ষা করছে নিঃস্বার্থভাবে। এইসব বিলিনাতেও পাওয়া গেছে অনেক রূপকথার গল্প।

আগেই বলেছি আধুনিককালে রূপকথা পড়তে ছোটরাই ভালোবাসে। তবে এর গভীর গভীরতর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেন বড়রাই। সেজন্যে রূপকথা ছোটদের-বড়দের সকলের। রূপকথার প্রধান ঐশ্বর্য ভাষার কমনীয়তা, নায়কের মহত্ত্ব ও মোহনীয়তা। রূপকথা মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করে সুন্দর হতে। সাধারণ মানুষকে নিজেদের শক্তিতে আস্থাশীল হতে শেখায়। স্বপ্ন দেখায় উন্নত ভবিষ্যতের। মন্দের ওপর ভালোর জয় অবশ্যম্ভাবী—এ প্রত্যয় গড়ে তোলে সাধারণ মানুষের মনে।

০১০/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা ১২১৭ **আহমাদ মাযহার**

ব্যাঙ রাজকুমারী ১১
বরফ-বুড়ো ১৭
ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত ২০
সিভ্‌কা-বুর্কা ২৭
অ-জানি দেশের না-জানি কী ৩২
ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ৪৭
মাছের আজ্ঞায় ৬৬
চাষির ছেলে ইভান আর আজব দানব ৭৩

অনুবাদ

সুফিয়া ঘোষ ও ননী ভৌমিক

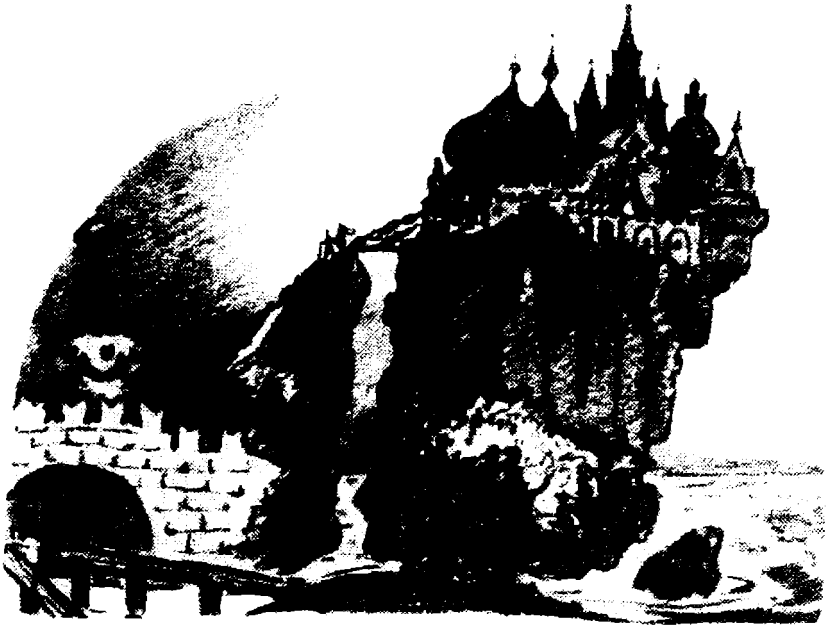

ব্যাঙ রাজকুমারী

অনেকদিন আগে ছিল এক রাজা। তার তিন ছেলে। সবাই যখন সাবালক হল তখন একদিন রাজা তাদের ডেকে বলল,

'দেখ বাছারা, আমি তোদের বিয়ে দিয়ে মরবার আগে নাতি-নাতনির মুখ দেখে যেতে চাই।'

ছেলেরা উত্তর দিল, 'সে তো ভালো কথা বাবা, আশীর্বাদ করুন। বলুন কাকে বিয়ে করব?'

'তোমরা প্রত্যেকে এক-একটি করে তীর নিয়ে ফাঁকা মাঠে গিয়ে ছুড়বে। যার তীর যেখানে পড়বে তার ভাগ্য সেখানে বাঁধা।'

রাজপুত্ররা বাবাকে সালাম করে একটি করে তীর নিয়ে ফাঁকা মাঠে চলে গেল। ধনুক টেনে তীর ছুড়ল।

বড় রাজপুত্রের তীর পড়ল এক আমিরের বাড়ির উঠোনে। আমিরের মেয়ে সেটি তুলে নিল। মেজো রাজপুত্রের তীর পড়ল এক সওদাগরের বাড়ির উঠোনে। সওদাগরের মেয়ে সেটি তুলে নিল।

কিন্তু ছোট ইভান রাজপুত্রের তীর উঁচুতে উঠে কোথায় যে গেল, কে জানে। তীরের খোঁজে রাজপুত্র চলে আর চলে। যেতে যেতে একটা জলার কাছে এসে দেখে একটা ব্যাঙ তীরটা নিয়ে বসে আছে।

রাজপুত্র বলল, 'ব্যাঙ, ও ব্যাঙ, আমার তীর ফিরিয়ে দাও।'

আর ব্যাঙ বলে, 'আগে বিয়ে করো আমায়!'

'সে কী, একটা ব্যাঙকে বিয়ে করব কী?'

'বিয়ে কর, সেই যে তোমার ভাগ্য।'

রাজপুত্রের ভীষণ দুঃখ হল। কিন্তু কী আর করে! ব্যাঙটাকে তুলে বাড়ি নিয়ে এল। রাজা তিনটে বিয়ের উৎসব করল : বড়জনের বিয়ে দিল আমিরের মেয়ের সঙ্গে, মেজোজনের সওদাগর কন্যার সঙ্গে আর বেচারি ছোট ইভান রাজপুত্রের বিয়ে হল একটা ব্যাঙের সঙ্গে।

একদিন রাজা ছেলেদের ডেকে বলল, 'আমি দেখতে চাই, তোমাদের কোন বৌয়ের হাতের কাজ ভালো। কাল সকালের মধ্যে সবাই একটা করে শার্ট সেলাই করে দিক।'

ছেলেরা বাবাকে সালাম করে বেরিয়ে গেল।

ছোট ইভান রাজপুত্র বাড়ি গিয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। ব্যাঙটা থপ্‌থপ্‌ করে এসে জিজ্ঞেস করে,

'কী হল রাজপুত্র, মাথা হেঁট কেন? কোনো বিপদে পড়েছ বুঝি?'

'বাবা বলেছেন, তোমায় কাল সকালের মধ্যে একটা শার্ট সেলাই করে দিতে হবে।'

ব্যাঙ বলল,

'ভাবনা নেই ইভান রাজপুত্র, বরং ঘুমিয়ে নাও। রাত পোহালে বুদ্ধি খোলে।'

রাজপুত্র শুতে গেল। আর ব্যাঙ করল কী, থপ্‌থপিয়ে বারান্দায় গিয়ে ব্যাঙের চামড়া খসিয়ে হয়ে গেল যাদুকরী ভাসিলিসা—রূপবতী সেই, তুলনা তার নেই!

জাদুকরী ভাসিলিসা হাততালি দিয়ে ডেকে বলল,

'দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বেঁধে লাগো! কাল সকালের মধ্যেই আমায় একটা শার্ট সেলাই করে দেওয়া চাই, ঠিক যেমনটি আমার বাবা পরতেন।'

পরদিন সকালে ইভান রাজপুত্র উঠে দেখে ব্যাঙ থপ্‌থপ্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর টেবিলের ওপর তোয়ালেমোড়া একটি শার্ট। রাজপুত্রের আর আনন্দ ধরে না। শার্টটা নিয়ে এল সোজা বাপের কাছে। রাজা তখন অন্য ছেলেদের উপহার নিচ্ছে। বড় ছেলের শার্টটা নিয়ে রাজা বলল,

'এ শার্ট পরে দীনদরিদ্র।'

মেজো রাজপুত্র শার্টটা মেলে ধরতেই রাজা বলল,

'এটা পরে বাইরে যাওয়া চলে না।'

এবার ইভান রাজপুত্র তার শার্টটা মেলে ধরল। সে শার্টে সোনায় রুপোয় চমৎকার নকশা তোলা। চোখ পড়তেই রাজা বলল,

একেই বলে শার্ট। পালপার্বণে পরার মতো।'

বড় দু'ভাই বাড়ি যেতে যেতে বলাবলি করে,

'ইভান রাজপুত্রের বৌকে নিয়ে আমাদের হাসাহাসি করা ঠিক হয় নি। ব্যাঙ নয় ও মায়াবিনী...'

আবার রাজা তিন ছেলেকে ডেকে পাঠাল।

'তোমাদের বৌদের বলো কাল সকালের মধ্যে আমায় রুটি বানিয়ে দিতে হবে। কে সবচেয়ে ভালো রাঁধে দেখব।'

আবার ছোট ইভান রাজপুত্র মাথা হেঁট করে বাড়ি ফিরে এল। ব্যাঙ বলল,

'রাজপুত্র, এত মনভার কেন?'

'রাজামশাই বলেছেন কাল সকালের মধ্যে রুটি বানিয়ে দিতে হবে।'

'ভাবনা কোরো না রাজপুত্র। শুতে যাও, রাত পোহালে বুদ্ধি খোলে।'

অন্য বৌরা ব্যাঙকে নিয়ে আগে হাসাহাসি করেছে। এবার কিন্তু এক বুড়ি দাসীকে পাঠিয়ে দিল দেখে আসতে, কী করে ব্যাঙ রুটি বানায়।

ব্যাঙ কিন্তু ভারি চালাক। টের পেয়ে গেল ওদের মতলব। তাই ময়দা মেখে লেচি তৈরি করে নিয়ে চুল্লির উপরটা ভেঙে সবটা লেচি সেই গর্তে ঢেলে দিল। বুড়ি দাসী দৌড়ে গিয়ে রাজবধূদের খবর দিল। বৌরাও ঠিক তাই করতে লাগল।

তারপর ব্যাঙ কিন্তু ওদিকে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে যাদুকরী ভাসিলিসা হয়ে গেল। হাততালি দিয়ে ডেকে বলল,

'দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বেঁধে লাগো। কাল সকালের মধ্যেই আমায় একটা সাদা ধবধবে নরম রুটি বানিয়ে দিতে হবে, ঠিক যেমনটি আমি বাড়িতে খেতাম।'

পরদিন সকালে রাজপুত্র উঠে দেখে টেবিলের উপরে এক রুটি, গায়ে তার নানা রকম নকশা; চারিপাশে কত শত মূর্তি, উপরে নগর আর তোরণ।

রাজপুত্র ভারি খুশি, তোয়ালেমুড়ে রুটি নিয়ে গেল বাবার কাছে। রাজা তখন বড় ছেলেদের রুটি নিচ্ছিল। বুড়ি দাসির কথামতো বড় দুই ভাইয়ের বৌ ময়দাটা সোজা চুল্লির ভিতর ফেলে দিয়েছিল। ফলে যা হল সে এক পোড়াধরা এক একটা তাল। রাজা বড় ছেলের হাত থেকে রুটিটা নিয়ে দেখেই পাঠিয়ে দিল নোকর মহলে। মেজো রাজপুত্রের রুটিরও সেই একই দশা হল। আর ছোট ইভান রাজপুত্র রাজার হাতে রুটি দিতেই রাজা বলে উঠল,

'একেই বলে রুটি! এই হল পালপার্বণে খাওয়ার মতো।'

পরদিন রাজা তার তিন ছেলেকে বৌ নিয়ে নেমন্তন্নে আসতে বলল।

ইভান রাজপুত্র আবার মুখ ভার করে বাড়ি ফিরল, দুঃখে মাথা হেঁট করল। ব্যাঙ থপ্‌থপ্‌ করে লাফায়,

'ঘ্যাঙর ঘ্যাং, ঘ্যাঙর ঘ্যাং, রাজপুত্র, মন খারাপ কেন তোমার? বাবা বুঝি কিছু মন্দকথা বলেছেন!'

'ব্যাঙ-বৌ, ব্যাঙ-বৌ, মন খারাপ না হয়ে করি কী? বাবা চান তোমাকে নিয়ে আমি নেমন্তন্নে যাই। কিন্তু লোকজনের সামনে তোমায় দেখাই কী করে?'

ব্যাঙ বলে,

'রাজপুত্র, ভাবনা কোরো না, একাই যেও নেমন্তন্নে, আমি পরে যাব। খট্‌খট্‌ দুমদাম্‌ শব্দ হলে ভয় পেও না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, 'আমার ব্যাঙ বৌ আসছে কৌটায় চড়ে।'

ইভান রাজপুত্র তাই একাই গেল। বড় দুই ভাই গেল গাড়ি হাঁকিয়ে, বৌ জাঁকিয়ে। কত বেশ, কত ভূষা, গালে রঙ, চোখে কাজল। সবাই ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

'সে কী, তোর বৌকে আনলি না যে? একটা রুমালে করেও তো আনতে পারতি, সত্যি রূপসীকে জোটালি কোথা থেকে? কোন খাল বিল তল্লাশ করে?'

তিন ছেলে নিয়ে, ছেলের বৌ নিয়ে, অতিথি-অভ্যাগত নিয়ে রাজা সাহেব বসল জাজিম ঢাকা ওককাঠের টেবিলে। ভোজ শুরু হবে। হঠাৎ শুরু হল খট্‌খট্‌ দুম্‌দাম্‌ আওয়াজ। সে আওয়াজে সারা রাজপুরী কেঁপে উঠল থর্‌থরিয়ে, অতিথিরা ভয়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ইভান রাজপুত্র বলল, 'অতিথিসজ্জন ভয় নেই, ও আমার ব্যাঙ-বৌ এল কৌটায় চড়ে।'

ছ'টা সাদাঘোড়ার টানা সোনামোড়া এক জুড়িগাড়ি এসে থামল রাজপুরীর অলিন্দের কাছে। গাড়ি থেকে নেমে এল যাদুকরী ভাসিলিসা আকাশী-নীল পোশাকে তার ঝলমলে তারা; মাথায় জ্বলজ্বলে বাঁকাচাঁদ; সে কী রূপ, জানার নয় বোঝার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়। ভাসিলিসা ইভান রাজপুত্রের হাত ধরে নিয়ে গেল জাজিম ঢাকা ওককাঠের টেবিলে।

শুরু হল পানভোজন, ফুর্তি। যাদুকরী ভাসিলিসা করল কী, গেলাস থেকে পান করে বাকিটুকু ঢেলে দিল বাঁহাতার মধ্যে। মরালীর মাংস কামড়ে খেয়ে হাড়গুলো রেখে দিল ডানহাতার মধ্যে।

দেখাদেখি বড় বৌ দু'জনও তাই করল।

খাওয়া হল দাওয়া হল, শুরু হল নাচ। যাদুকরী ভাসিলিসা ইভান রাজপুত্রের হাত ধরে এগিয়ে গেল। তালে-তালে নাচে, ঘুরে-ঘুরে নাচে—সবাই একেবারে অবাক। নাচতে নাচতে বাঁহাত দোলাল ভাসিলিসা আর হয়ে গেল একটা হ্রদ। ডান হাত দোলাল, অমনি সাদা সাদা মরালী জেগে উঠল। রাজা আর অতিথি-অভ্যাগতেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক।

তারপর অন্য বৌরাও নাচতে উঠল। ওরাও এক হাত দোলাল, অতিথিদের গা ভিজল শুধু। অন্য হাত দোলাল, ছড়িয়ে পড়ল শুধু হাড়। একটা হাড় গিয়ে লাগল একেবারে রাজার চোখে। রাজা ভয়ানক রেগে গিয়ে তক্ষুনি দুই বৌকে বের করে দিল।

ইতিমধ্যে ইভান রাজপুত্র করেছে কী, লুকিয়ে লুকিয়ে দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ব্যাঙের চামড়াটা ছুড়ে সোজা একেবারে উনুনে।

যাদুকরী ভাসিলিসা বাড়ি এসে ব্যাঙের চামড়া আর খুঁজে পায় না! মনের দুঃখে একটা বেঞ্চে বসে ভাসিলিসা রাজপুত্রকে বলল,

'এ কী করলে রাজপুত্র! আর যদি তিন দিন অপেক্ষা করতে তবে আমি চিরদিনের মতো তোমার হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন বিদায়। সাতসমুদ্দুর আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেখানে পিশাচরাজা থাকে সেখানে আমার খোঁজ করো...

এই বলে যাদুকরী ভাসিলিসা একটা ধূসর রঙের কোকিল হয়ে উড়ে গেল জানালা দিয়ে। রাজপুত্র কাঁদে কাঁদে, তারপর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে সালাম করে চলে গেল যেদিকে দু'চোখ যায় : যাদুকরী ভাসিলিসাকে খুঁজে বের করবে। গেল অনেকদূর নাকি অল্পদূর, অনেকদিন নাকি অল্পদিন, কে জানে, বুটের গোড়ালি ক্ষয়ে গেল, জামার কনুই ছিঁড়ে গেল, টুপি হল ফাড়া-ফাড়া। যেতে যেতে এক থুড়থুড়ে ক্ষুদে বুড়োর সঙ্গে দেখা।

'কুশল হোক কুমার, কিসের খোঁজে নেমেছ? কোন পথে চলেছ?

রাজপুত্র বুড়োকে তার বিপদের কথা খুলে বলল। ক্ষুদে বুড়ো বলল,

'হায়, হায়, ব্যাঙের চামড়াটা পোড়াতে গেলে কেন রাজপুত্র, ওটা তোমার পরার নয়, ওটা তোমার খোলারও নয়। যাদুকরী ভাসিলিসা তার বাবার চেয়েও বেশি যাদুজ্ঞান নিয়ে জন্মেছিল। তাই ওর বাবা শাপ দিয়ে তিন বছরের জন্য ওকে ব্যাঙ করে দিয়েছিলেন। যাক, এখন তো আর কোনো উপায় নেই। এই সুতোর গুটি নাও। এটা যেদিকে গড়াবে সেদিকে যেও। ভয় পেয়ো না।'

ইভান রাজপুত্র বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে সুতোর গুটির পিছন পিছন চলল। সুতোর গুটি আগে আগে গড়িয়ে চলে, আর রাজপুত্র পিছন পিছন যায়। একদিন এক ফাঁকামাঠে ভালুকের সঙ্গে দেখা। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করে মারতে যাবে, হঠাৎ মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল ভালুক,

'মেরো না রাজপুত্র, কোনোদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র ভালুককে আর মারল না। এগিয়ে চলল। হঠাৎ দেখে একটা হাঁস মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করতেই হাঁসটা মানুষের গলায় বলে উঠল,

'মেরো না রাজপুত্র, কোনোদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র হাঁসটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একটা খরগোস দৌড়ে বেরিয়ে এল। রাজপুত্র তীর-ধনুক তুলে মারতে যাবে; খরগোসটা মানুষের মতো গলায় বলে উঠল,

'মেরো না রাজপুত্র, কোনোদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র খরগোসটাকে আর মারল না। এগিয়ে চলল। হাঁটতে-হাঁটতে দেখে কি, নীল সমুদ্রের ধারে একটা পাইকমাছ ডাঙার বালিতে পড়ে খাবি খাচ্ছে।

'ইভান রাজপুত্র, দয়া করো আমায়, নীল সমুদ্রে ছেড়ে দাও!'

রাজপুত্র পাইকমাছটা জলে ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে লাগল কতদিন কে জানে, সুতোর গুটি গড়াতে গড়াতে এল এক বনের কাছে। সেখানে রাজপুত্র দেখে মুরগির পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর ক্রমাগত ঘুরে চলেছে।

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও!'

কুঁড়েঘরটা বনের দিকে পিঠ রেখে রাজপুত্রের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। রাজপুত্র ঘরে ঢুকে দেখে চিমনির কাছে ন'থাক ইঁটের ওপর শুয়ে আছে বাবা-ইয়াগা ডাইনি, তার খ্যাংড়াকেঠো পা, দাঁত নেমেছে হেথা, নাক উঠেছে হোথা!

রাজপুত্রকে দেখে ডাইনিটা বলে উঠল, 'আমার কাছে কেন আগমন, সজ্জন কুমার? কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?' 'ওরে পাজি বুড়ি থুবড়ি, আগে খাওয়া দে, দাওয়া দে, গোসলের জন্য জল দে, তারপর জিজ্ঞেস করিস।'

বাবা-ইয়াগা আগে রাজপুত্রকে গরম জলে গোসল করাল, খাওয়াল দাওয়াল, বিছানা পেতে শোয়াল। ইভান রাজপুত্র তখন বাবা-ইয়াগাকে বলল যে সে তার বৌ যাদুকরী ভাসিলিসাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডাইনি বলল, 'জানি জানি! তোমার বৌ এখন পিশাচ রাজার কবলে। ওকে ফিরে পাওয়া বাপু মুশকিল। পিশাচ রাজার সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ না। ওর প্রাণ আছে এক ছুঁচের ডগায়, ছুঁচ আছে এক ডিমের ভিতর, ডিম আছে এই হাঁসের পেটে, হাঁস আছে এক খরগোসের পেটে, খরগোস আছে এক পাথরের সিন্দুকে, সিন্দুক আছে এক লম্বা ওকগাছের মাথায় আর এ গাছটা পিশাচ রাজার চোখের মণি, কড়া পাহারা সেখানে।'

রাজপুত্র রাতটা বাবা-ইয়াগার বাড়িতেই কাটাল। পরদিন সকালে বুড়ি তাকে সেই লম্বা ওকগাছে যাবার পথটা দেখিয়ে দিল। অনেকপথ নাকি অল্পপথ, কতদূর রাজপুত্র গেল কে জানে। দেখে—দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বা ওকগাছ। শনশন করছে তার পাতা, সেই গাছের মাথায় একটা পাথরের সিন্দুক। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

হঠাৎ কোথা থেকে সেই ভালুকটা এসে করল কী, শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দিল গাছটাকে। সিন্দুকটা দুম্ করে মাটিতে পড়ে ভেঙে চৌচির। অমনি সিন্দুক থেকে একটা খরগোস বেরিয়ে যত জোরে পারে দৌড়ে পালাতে গেল। কিন্তু সেই আগের খরগোসটা ওকে তাড়া করে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। অমনি খরগোসটার পেট থেকে একটা হাঁস বেরিয়ে সাঁ করে আকাশে উঠে গেল। তখন দেখতে না দেখতে সেই আগের হাঁসটা তাকে ধাওয়া করে ঝাপটা মারতেই ডিম পড়ল। সে ডিম পড়ল নীল সমুদ্রে...

রাজপুত্র তখন ভীষণ কাঁদতে লাগল। সমুদ্র থেকে কী করে এখন ডিম খুঁজে পাবে! হঠাৎ দেখে সেই পাইকমাছটা সাঁতার কেটে পারের দিকে আসছে, মুখে সেই হাঁসের ডিমটা। রাজপুত্র ডিমটা নিয়ে ভেঙে ফেলল। তারপর ভাঙতে লাগল ছুঁচের ডগা। রাজপুত্র ভাঙে আর উথালপাথাল করে পিশাচ রাজা, দাপাদাপি করে। কিন্তু যতই করুক পিশাচ রাজা—ছুঁচের ডগাটি ভেঙে ফেলল রাজপুত্র, মরতে হল তাকে।

রাজপুত্র তখন চলল পিশাচের শ্বেতপাথরের পুরীতে। যাদুকরী ভাসিলিসা ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে। চুমো খেল তার মধুঢালা মুখে। তারপর ভাসিলিসা আর রাজপুত্র দুজনে নিজেদের দেশে ফিরে এল। সেখানে তারা অনেক বুড়ো বয়স অবধি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরকন্না করতে লাগল।

বরফ-বুড়ো

এক ছিল বুড়ো আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। বুড়োর এক মেয়ে আর দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের নিজের এক মেয়ে।

সৎমায়েরা কেমন সে তো সবাই জানে। ভালো কাজ করলেও লাথি ঝাঁটা, মন্দ কাজ করলেও লাথি ঝাঁটা। নিজের মেয়েটির বেলায় কিন্তু অন্যরকম—সে যাই করে তাই ভালো। সবেতেই তার আদর।

সূর্য ওঠার আগেই সৎমেয়েটি ওঠে, গরুবাছুরকে খাওয়ায়, জ্বালানি কাঠ আর জল আনে, উনুনে আগুন দেয়, ঘর ঝাঁটা দেয়। কিন্তু বুড়ির আর মন ওঠে না, সবই তার খারাপ, সবই ঠিক তেমনটি নয়।

ঝড় উঠলে ঝড়ও শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু বুড়িমেয়ের রাগ একবার উঠলে আর শান্তি নেই। সৎমা ঠিক করল সৎমেয়েটাকে দুনিয়া থেকেই সরাতে হবে।

বুড়োকে বলে, 'মেয়েটাকে এখান থেকে সরা বাপু। যেখানে খুশি দিয়ে আয়, চোখে যেন না দেখতে হয়! বনে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আয় শীতের মধ্যে।'

বুড়ো মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। কিন্তু জানে কোনো উপায় নেই। বুড়িকে টলানো যাবে না। কাজেই লাগাম পরিয়ে ঘোড়া যুতে মেয়েকে ডাকল, 'আয় মা, স্লেজে ওঠ।'

অভাগা মেয়েটিকে দূরে বনে নিয়ে বড় ফার গাছের নিচে একটা বরফের স্তূপের মধ্যে ফেলে রেখে ফিরে এল বুড়ো।

সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা। মেয়েটি ফার গাছতলায় বসে বসে কাঁপছে, ঠকঠক করছে। হঠাৎ শোনে আশেপাশের গাছের ডালে চড়বড় আওয়াজ তুলে এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে বরফ-বুড়ো। চোখের পলকেই বরফ-বুড়ো মেয়েটি যে গাছতলায় বসেছিল সেই গাছে এসে হাজির।

ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'বাছা, তোর শীত লাগছে না তো?'

মেয়েটি নরম করে উত্তর দিল, 'না, শীতবাবাজি, শীত করছে না।'

বরফ-বুড়ো তখন আরো নিচে নেমে এল। চড়বড় আওয়াজ উঠল আরো জোরে।

'শীত করছে না, মেয়ে? সত্যি শীত করছে না, কন্যে?'

মেয়েটি নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না, তবু বলল, 'না, শীতবাবাজি, ঠাণ্ডা লাগছে না।'

বরফ-বুড়ো আরো নিচে নেমে এল। বরফ পড়ার চড়বড় শব্দ বেড়ে উঠল ভয়ানক।

জিজ্ঞেস করল, 'শীত লাগছে না, মেয়ে? এখনো শীত করছে না, কন্যে? শীত লাগছে না তোর, সুন্দরী?'

মেয়েটি তখন প্রায় জমে অবশ। জিভও যেন নড়ে না। কোনোরকমে বলল, 'না, শীতবাবাজি, শীত করছে না।'

বরফ-বুড়োর তখন দয়া হল। মেয়েটিকে সে ফোলা ফোলা নরম লোমওয়ালা কোট আর গরম লেপের পোষাক দিয়ে জড়িয়ে দিল।

এদিকে তো সৎমা মেয়েটির শ্রাদ্ধের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছে। সরু চাকলি ভাজে আর বুড়োকে বলে, 'এই মিন্‌সে, যা বনে যা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়, কবর দেব!'

বুড়ো বনে গিয়ে দেখে ঠিক যে জায়গাটায় রেখে গিয়েছিল সেই বড় ফার গাছটির নিচে বসে আছে মেয়েটি। দেখাচ্ছে ভারি খুশি খুশি, লাল টুকটুক করছে মুখটি। গায়ে তার একটা লোমের কোট, সর্বাঙ্গে সোনা-রুপোর গহনা। পাশেই একটা মস্ত সিন্দুক-দামি দামি উপহার ভরা।

বুড়ো আহ্লাদে আটখানা। মেয়েকে স্লেজে বসিয়ে, ধনসম্পদ তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল সে।

এদিকে সৎমা সরু চাকলি ভাজে আর ওদিকে টেবিলের নিচ থেকে কুকুরটা বলে, 'ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ে বাড়ি ফেরে ধনদৌলত নিয়ে, বুড়ির মেয়ে রইল পড়ে, হবে না তার বিয়ে!'

বুড়ি কুকুটাকে একটা সরু চাকলি ছুড়ে দিয়ে বলে, 'ও কথা নয় কুকুর, বল্, বুড়ির মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার, বুড়োর মেয়ে হতচ্ছাড়ি বেঁচে সে নেই আর!'

কুকুরটা সরু চাকলি খেয়ে ফের শুরু করে, 'ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ে বাড়ি ফেরে ধনদৌলত নিয়ে, বুড়ির মেয়ে রইল পড়ে, হবে না তার বিয়ে!'

বুড়ি আরো কতকগুলো সরু চাকলি কুকুরটার দিকে ছুড়ে দিল। মারল কুকুরটাকে তবু কুকুরটার মুখে শুধু ঐ একই কথা...

হঠাৎ ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল ফটক, দরজা খুলে গেল। বুড়োর মেয়ে ঘরে ঢুকল। জামাকাপড় সোনা-রুপো, মণিমানিক্যে ঝলমল করছে। পেছন পেছন বুড়ো ঢুকল মস্ত ভারী সিন্দুকটা নিয়ে। তাকিয়ে দেখেই বুড়ির হাতদুটো ঝুলে পড়ল হতাশে...

'যা মুখপোড়া বুড়ো, গাড়ি যুতে নে! তারপর তোর মেয়েকে যেখানে রেখে এসেছিলি, আমার মেয়েকেও সেখানে রেখে আয়...'

বুড়ির মেয়েকে স্লেজে বসাল বুড়ো, বনে গিয়ে লম্বা ফার গাছটার তলায় বরফের ঢিপির মধ্যে রেখে দিয়ে এল।

বুড়ির মেয়ে বসে আছে গাছতলায়। শীতের চোটে দাঁত-কপাটি।

মড়মড়িয়ে ঠকঠকিয়ে, এগাছ থেকে ওগাছে লাফাতে লাফাতে বরফ-বুড়ো এসে হাজির। বুড়ির মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে, 'বাছা, তো শীত করছে না তো?'

বুড়ির মেয়ে কিন্তু বলে, মা গো, জমে গেছি! দোহাই শীতবাবাজি, অমন মড়মড়িয়ো না, ঠকঠকিয়ো না...'

বরফ-বুড়ো আরো নিচে নেমে আসে আর জোরে জোরে ঠকঠকায়, চড়বড়ায়।

বলল, 'শীত করছে না, মেয়ে? শীত করছে না তো, কন্যে?'

মেয়ে বলল, 'উহু রে, হাত পা জমে গেছে! তুমি চলে যাও, শীতবাবাজি...'

আরো নিচে নেমে এল বরফ-বুড়ো, আরো জোরে ঝাপট মারে, ঠকঠকায়, চড়বড়ায়।

'শীত করছে না তো, কন্যে? শীত লাগছে না তো, সুন্দরী?'

'মা গো, একেবারে হাড় জমে গেছে! দূর হ, হতচ্ছাড়া শীত কোথাকার!'

রাগ হয়ে গেল বরফ-বুড়োর, বুড়ির মেয়েকে জাপটে ধরে জমিয়ে মেরে ফেলল। এদিকে সবে ভোর হয়েছে কি হয় নি, বুড়ি বুড়োকে বলে, 'তাড়াতাড়ি ওঠ মুখপোড়া বুড়ো, ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে চট করে যা, মেয়েকে নিয়ে আয়, সোনায় রুপোয় সাজিয়ে আনা চাই...'

বুড়ো তো ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আর কুকুরছানাটা ওদিকে টেবিলের তল থেকে বলে, 'ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার, বুড়ির মেয়ে মরল শীতে, উঠবে নাকো আর।'

বুড়ি কুকুরটাকে একটা পিঠে ছুড়ে দিয়ে বলে, 'ও কথা নয়, বল, 'বুড়ির মেয়ে বাড়ি ফেরে ধনদৌলত নিয়ে...'

কুকুর কিন্তু আগের মতো বলেই চলল, 'ভেউ, ভেউ! বুড়ির মেয়ে মরল শীতে, উঠবে নাকো আর...'

ফটক খোলার আওয়াজ হল। মেয়েকে এগিয়ে আনবার জন্যে বুড়ি ছুটল হুড়মুড় করে। তারপর ঢাকা সরিয়ে দেখে, স্লেজের ওপর তার মরা মেয়ে শুয়ে।

ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল বুড়ি, কিন্তু আর তো উপায় নেই।

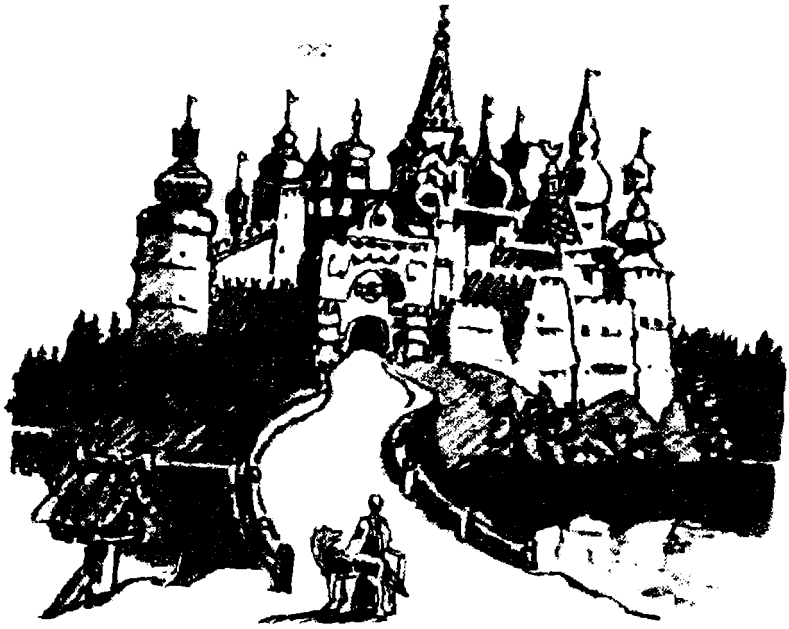

ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত

এক যে ছিল চাষি। তিন মেয়ে রেখে মারা গেল চাষির বৌ। চাষি ভাবল একটা ঝি রাখা যাক, সংসারের কাজকর্ম করবে। কিন্তু চাষির সবচেয়ে ছোট মেয়ে মারুশকা বলল, 'ঝি আর রেখ না, বাবা। আমি একাই সংসার দেখব।'

তাই সই। মারুশকাই সংসার দেখে। সবেতেই তার হাত। সবেতেই সে বড়। মারুশকাকে খুব ভালোবাসে চাষি। এমন চালাক চতুর কাজের মেয়ে পেয়ে তার ভারি আনন্দ। দেখতেও পটের সুন্দরী! তার অন্য বোনেরা কিন্তু হিংসুটে আর লোভী। এদিকে রূপ নেই আর ফ্যাশনের ঘটা, সারাক্ষণ রং মাখে, রুজ মাখে, সেজেগুজে বসে থাকে। এ সাজ, সে সাজ, এ জুতো, সে জুতো, এ রুমাল সে রুমাল।

একদিন বুড়ো চাষি বাজারে যাবে। মেয়েদের ডেকে বলল, 'তোদের কার জন্যে কী আনব, বাছারা? কী পেলে খুশি হবি?'

বড় দু'বোন বলল, 'একটা করে শাল এন—ফুল-তোলা, সোনা-ঝলা।' মারুশকা চুপ করে থাকে। বাপ জিজ্ঞাসা করল, 'আর তোর কী চাই, মারুশকা?'

'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের একটা পালক এন।'

চাষি বাজার থেকে দুটো শাল নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু পালক আর পেল না।

পরের বার চাষি আবার বাজারে গেল। বলে, 'কী চাই তোদের, ফরমাশ কর।'

দুজন খুশি হয়ে বলল, 'আমাদের জন্যে একজোড়া করে রুপোর নাল বসানো জুতো এন।'

মারুশকা কিন্তু আবার বলে, 'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের একটা পালক এন।'

সারাদিন বাজারে ঘুরে ঘুরে চাষি দু'জোড়া জুতো কিনল। কিন্তু ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের পালক কিছুতেই পেল না। পালক ছাড়াই ফিরে এল।

বারবার তিন বার। চাষি আবার চলল বাজারে। বড় দুই মেয়ে বলে, 'আমাদের জন্যে দুটো নতুন পোশাক এন, বাবা।'

কিন্তু মারুশকা আবার বলে, 'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিলিস্তের পালক এন।'

বেচারী চাষি সারা দিন ঘুরে বেড়াল। কিন্তু পালক কোথাও পেল না। শহর ছেড়ে বেরুতেই এক বুড়োর সঙ্গে দেখা।

'কী দাদু, ভালো তো?'

'ভালোই বাছা! চললে কোথায়?'

'বাড়ি ফিরছি দাদু, গ্রামে। কিন্তু ভারি মুশকিলে পড়েছি। ছোট মেয়ে বেরোবার সময় বলে দিয়েছিল ঝলমলে বাজ ফিলিস্তের একটা পালক আনতে। তা আমি কোথাও খুঁজে পেলাম না।'

'তেমন পালক আমার একটা আছে। ও কিন্তু জাদুর পালক। তবে ভালো লোককে দিতে বাধা নেই।'

বুড়ো বের করে চাষির হাতে দিল পালকটা—সাধারণ পালক। যেতে যেতে চাষি ভাবে, 'এর মধ্যে ভালো কী দেখল মারুশকা?'

বাড়ি পৌঁছে চাষি মেয়েদের জিনিস ভাগ করে দিল। বড় দুই বোন তাদের নতুন সজ্জায় সাজে আর মারুশকাকে দেখে হাসে, 'যা বোকা ছিল সেই বোকাই রয়ে গেল! তারপর বাড়ির সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, মারুশকা তখন পালকটা মেঝেয় ফেলে আস্তে আস্তে বলে কি, 'লক্ষ্মী ফিনিস্ত—ঝলমলে বাজ, পথ চাওয়া বর এস গো আজ।'

অমনি এক অপরূপ সুন্দর কুমার এসে হাজির। ভোর হতেই কুমার মেঝেয় আছাড় খেয়ে আবার বাজপাখি হয়ে গেল। মারুশকা জানালা খুলে দিতেই পাখিটা উড়ে গেল নীল আকাশে।

পর পর তিন রাত্তির মারুশকা কুমারকে ডেকে আনল। সারাদিন সে বাজপাখি হয়ে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু যেই রাত হয়ে আসে অমনি মারুশকার কাছে এসে দাঁড়ায় অপূর্ব এক সুন্দর কুমার।

চতুর্থ দিন হিংসুটে দুই বোন তা দেখে ফেলল। বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করল।

চাষি বলল, 'তোরা বাপু নিজেদের চরকায় তেল দে তো।'

বোনেরা ভাবে, 'বেশ, দেখা যাবে কী দাঁড়ায়।'

কতগুলো ধারালো ছুরি জানালার বাজুতে পুঁতে রেখে লুকিয়ে রইল তারা।

উড়ে এল সেই ঝলমলে বাজপাখি। জানালা অবধি আসে, কিন্তু মারুশকার ঘরে আর ঢুকতে পারে না। জানালার কাচে পাখিটা সমানে ঝাপটা মেরে চলে। বুক তার কেটে কেটে যায়। মারুশকা কিন্তু কিছুই জানে না। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পাখিটা তখন বলে উঠল, 'যে আমায় চায়, সে আমায় পাবে, কিন্তু সহজে নয়। তিন জোড়া লোহার জুতোর তলা ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙে, তিনটে লোহার টুপি ছিঁড়ে তবে।'

এই কথা মারুশকার কানে যেতেই সে লাফিয়ে উঠল, চাইল জানালার দিকে, কিন্তু বাজপাখি নেই, জানালায় শুধু রক্তের দাগ। খুব কাঁদতে লাগল মারুশকা। চোখের জলে রক্তের দাগ মুছে নিল, হয়ে উঠল আরো সুন্দর।

বাবার কাছে গিয়ে মারুশকা বলল, 'আমায় বকো না বাবা, আমি চললাম দূরের পথে। বেঁচে থাকি দেখা হবে। না থাকি, তবে সেই আমার নির্বন্ধ।'

খুব কষ্ট হচ্ছিল চাষির তবু শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হল তার আদরের মেয়েটিকে।

মারুশকা তাই তিন জোড়া লোহার জুতো, তিনটে লোহার দণ্ড, আর তিনটে লোহার টুপি ফরমাশ দিল। তারপর তার চিরবাঞ্ছিত বন্ধু ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে খুঁজতে পাড়ি দিল দূরের পথে। চলল সে খোলা মাঠ ভেঙে, ঘন বন পেরিয়ে, খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে। পাখিরা ওকে গান শুনিয়ে খুশি করে, ঝরনা ওর সুন্দর ধবধবে মুখখানি ধুয়ে দেয়, ঘন বন ওকে ঢেকে নেয়। মারুশকার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে না। পাঁশুটে নেকড়ে, শেয়াল, ভালুক, জঙ্গলের যত জন্তু সবাই ছুটে আসে তার কাছে। হাঁটতে হাঁটতে একজোড়া লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, একটা লোহার দণ্ড ভাঙল, একটা লোহার টুপি ছিড়ল।

মারুশকা তখন বনের একটা ফাঁকায় এসে দেখে, মুরগির পায়ের উপর একটা ছোট কুঁড়েঘর ঘুরে চলেছে।

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও! ভেতরে যাব, রুটি খাব।'

কুঁড়েঘরটা তখন বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মারুশকার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। মারুশকা ঘরে ঢুকে দেখে, বসে আছে এক ডাইনি, বাবা-ইয়াগা—খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘরজোড়া তার ঠ্যাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে।

ডাইনিটা মারুশকাকে দেখেই বলে উঠল, 'হাউমাউখাউ, রুশির গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে বেরিয়েছি, ঠাকুমা।'

'সে যে অনেক দূর গো, সুন্দরী। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে তিন নয়ের রাজ্যে। রাণী-মায়াবিনী তাকে জাদু করা সরবৎ খাইয়ে বিয়ে করেছে। তবে আমি তোকে সাহায্য করব। এই নে একটা রুপোর পিরিচ আর একটা সোনার ডিম। তিন নয়ের রাজ্যে গিয়ে রাজবাড়ির দাসীর কাজ নিস। কাজের পর এই ডিমটা রাখিস পিরিচে। নিজে থেকেই ডিমটা ঘুরবে। কিনতে চাইলে এমনিতে দিস না। ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।'

মারুশকা বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আঁধার হয়ে উঠল বন, হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। পা ফেলতেও ভয় করে মারুশকার। এমন সময় এল এক বেড়াল লাফিয়ে মারুশকার কোলে উঠে ঘড়ঘড় করে বলল, 'ভয় পেও না মারুশকা, এগিয়ে যাও। যত এগোবে তত ভয়ানক হয়ে উঠবে বনটা। কিন্তু থেম না। আর খবরদার, পিছন দিকে তাকিও না।'

বেড়ালটা মারুশকার পায়ে গা ঘষে চলে গেল! মারুশকা তো এগিয়ে চলে। যত এগোয় বনও তত গভীর, তত অন্ধকার হয়ে ওঠে। তবু হেঁটেই চলে মারুশকা। আরো একজোড়া লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, লোহার দণ্ড ভেঙে গেল, লোহার টুপিটা ছিঁড়ে গেল। মারুশকা এসে পড়ল একটা কুঁড়েঘরের সামনে। কুঁড়েটা একটা মুরগির পায়ের উপর বসানো। চারিদিকে বেড়া। আর খুঁটির ডগায় সব মাথার খুলি, তাতে আগুন জ্বলছে।

মারুশকা বলল, 'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও! ভেতরে যাব, রুটি খাব।'

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ওর দিকে মুখ করে দাঁড়াল কুঁড়েঘর। মারুশকা ঢুকে গেল ভিতরে। দেখে, ডাইনি, বাবা-ইয়াগা—খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘরজোড়া তার ঠ্যাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে।

মারুশকাকে দেখে ডাইনি বলল, 'হাউমাউখাউ, রুশির গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে চলেছি, ঠাকুমা।'

'আমার বোনের কাছে গিয়েছিলি?'

'গিয়েছিলুম, ঠাকুমা।'

বেশ। তবে আমি তোকে সাহায্য করব, সুন্দরী। এই সোনার ছুঁচ রুপোর ফ্রেমটা নে। ছুঁচটা নিজে নিজেই লাল মখমলে সোনালি রুপোলি নকশা তুলবে। কেউ কিনতে চাইলে দিস না। ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।'

বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে মারুশকা চলল। বনের মধ্যে মড়মড় করে, দুমদাম করে, শনশন করে। ঝোলানো মাথার খুলিগুলো থেকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে ভুতুড়ে আলো। ভয়ে মরে মারুশকা। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কুকুর দৌড়ে এল, 'ভেউ, ভেউ, মারুশকা, ভয় কর না লক্ষ্মীটি। এগিয়ে যেও, বন আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। পিছন দিকে তাকিও না।'

এই বলেই কোথায় উধাও। মারুশকা হাঁটে তো হাঁটে। আরো ঘন কালো হয়ে ওঠে বনটা। পা ঠেকে ঠেকে যায়, আস্তিন বেঁধে বেঁধে যায়...হাঁটে আর হাঁটে মারুশকা, পিছনে তাকায় না।

অনেক দিন, নাকি অল্প দিন, কে জানে। লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, লোহার দণ্ড ভেঙে গেল, লোহার টুপিটা ছিঁড়ে গেল। পৌঁছল মারুশকা বনের মধ্যে ঘাসে ঢাকা ফাঁকা একটা জায়গায়; দেখে, মুরগির পায়ের ওপর একটা কুঁড়েঘর। লম্বা লম্বা খুঁটি

দিয়ে ঘের দেওয়া। খুঁটির ডগায় ডগায় আগুনে ধকধক করছে ঘোড়ার মাথার খুলি।

মারুশকা বলল, 'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও!'

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মারুশকার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কুঁড়েঘর। মারুশকা ভিতরে ঢুকে গেল। দেখে, ডাইনি, বাবা-ইয়াগা—খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘরজোড়া তার ঠ্যাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে। একটি দাঁত শুধু নড়বড় করছে মুখে। মারুশকাকে দেখে গরগর করে উঠে বুড়িটা, 'হাউমাউখাউ, রুশির গন্ধ পাউ! কী রে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'আমি চলেছি ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে।'

'তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, সুন্দরী। কিন্তু আমি তোকে সাহায্য করব। এই রুপোর তকলি, সোনার টাকু। টাকুটা হাতে ধরলেই নিজে নিজে সোনার সুতো কাটা হবে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ঠাকুমা।

'ধন্যবাদ পরে দিস, এখন শোন! টাকুটা যদি কিনতে চায় দিস না। ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।'

মারুশকা বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলল তার পথ ধরে। বনে তখন ঘড়ঘড় গর্জন, গুরুগুরু ডাক, সাঁইসাঁই আওয়াজ। প্যাঁচারা পাক খেয়ে পড়ে, ইঁদুরেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে—সবই মারুশকার গায়ে। হঠাৎ একটা পাঁশুটে নেকড়ে কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, 'ভয় নেই মারুশকা, আমার পিঠে চড়ে বস, পিছনে তাকিও না।'

মারুশকা তখন নেকড়ের পিঠে চড়ে বসতেই এক পলকে উধাও। সামনে তার অঢেল স্তেপ, মখমলি মাঠ, মধুর নদী, হালুয়ার পাড়, মেঘ-ছোঁয়া উঁচু পাহাড়। ছুটতে ছুটতে নেকড়ে ওকে নিয়ে এল এক স্ফটিকের পুরীর সামনে। তার জালি-কাজের অলিন্দ, কারুকাজের জানালা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে রানী।

নেকড়ে বলল, 'তাহলে এবার পিঠ থেকে নাম, মারুশকা, রাজপুরীতে দাসীর কাজ নাও গে।'

মারুশকা নেকড়ের পিঠ থেকে নেমে পোঁটলাটা নিয়ে নেকড়েকে অনেক ধন্যবাদ দিল। রানীর কাছে কুর্নিশ করে মারুশকা বলে, 'জানি না কী বলে ডাকব, কী মানে মান্যি করব, আপনার বাড়িতে কি দাসী লাগবে?"

রানী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাপু, অনেক দিন থেকে একটি দাসী খুঁজছি যে সুতো কাটতে, কাপড় বুনতে, নকশা তুলতে জানে।'

মারুশকা বলল, 'এ সবই পারি।'

'তাহলে এস, কাজে লেগে যাও!'

রাজবাড়ির দাসী হল মারুশকা। দিনভর কাজ করে, তারপর রাত হতেই রুপোর পিরিচ সোনার ডিমটা বের করে বলে, 'রুপোর পিরিচে সোনার ডিম ঘুরে যা, ঘুরে যা। দেখিয়ে দে, কোথায় আমার ফিনিস্ত।'

আর অমনি ডিমটা ঘোরে আর ঘোরে আর সামনে এসে দাঁড়ায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত। চেয়ে চেয়ে মারুশকার আর সাধ মেটে না, দু'চোখ তার জলে ভেসে যায়।

'ফিনিস্ত আমার, ফিনিস্ত! কেন ছেড়ে গেলে এই হতভাগিনীকে। কেঁদে যে আর বাঁচি না...'

রানী সে কথা শুনতে পেয়ে বলে, 'মারুশকা, তোমার রুপোর পিরিচ সোনার ডিম আমায় বেচে দাও।'

মারুশকা বলল, 'না, এ আমার বিক্রির নয়, তবে তুমি যদি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে দেখতে দাও তাহলে এটা তোমায় এমনিই দিয়ে দেব।'

রানী ভেবে-চিন্তে বলল, 'বেশ, তাই হোক। রাতে ও যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তোমায় দেখতে দেব।'

রাত হলে মারুশকা ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের ঘরে গেল। দেখে তার আদরের ফিনিস্ত গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। সে ঘুম ভাঙে না। দেখে দেখে মারুশকার আর সাধ মেটে না। তার মধুঢালা মুখে চুমু খেল মারুশকা, নিজের ধবধবে বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঘুমিয়েই রইল তার আদরের ধন ফিনিস্ত। কিছুতেই জাগল না। ভোর হয়ে গেল, তবুও মারুশকা তার ফিনিস্তের ঘুম ভাঙাতে পারল না...

সারাদিন সে কাজ করল। তারপর সন্ধ্যেবেলায় সে নিয়ে বসল তার রুপোর ফ্রেম সোনার ছুঁচ। সেলাই হতে থাকে, আর মারুশকা বলে, 'ফুল তুলে যা, ফুল তুলে যা। সেই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছবে আমার ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত।'

রানী সে কথা শুনতে পেয়ে বলল, 'মারুশকা, তোমার সোনার ছুঁচ রুপোর ফ্রেম আমায় বেচে দাও।'

মারুশকা বলল, 'বিক্রি আমি করব না। তবে তুমি যদি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে দেখতে দাও তাহলে এমনিই দিয়ে দেব।'

ভাবল রানী, ভেবে দেখল, তারপর বলল, 'বেশ, তাই সই। রাত্তিরে এসে ওকে দেখে যেও।'

রাত এল। মারুশকা শোবার ঘরে ঢুকে দেখল তার ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত অঘোরে ঘুমিয়ে।

'ওগো ফিনিস্ত, ওগো আমার ঝলমলে বাজ, ওঠ, ওঠ, ঘুম ভেঙে ওঠ'!

ফিনিস্ত কিন্তু অঘোরে ঘুমিয়ে। মারুশকা হাজার চেষ্টা করেও তাকে জাগাতে পারল না।

ভোর হয়ে গেল। কাজকর্মে লাগল মারুশকা, রুপোর তকলি আর সোনার টাকু নিয়ে বসল। তা দেখে রানী বলে, 'বেচে দাও মারুশকা, বেচে দাও!'

মারুশকা বলল, 'বেচার জন্যে বেচব না। তবে যদি তুমি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে কেবল এক ঘণ্টা থাকতে দাও তাহলে তোমায় এমনিই দিয়ে দিতে পারি।'

রানী বলল, 'বেশ।'

মনে মনে ভাবল, 'জাগাতে তো আর পারবে না।'

রাত্তির হল। মারুশকা এসে ঢুকল শোবার ঘরে, কিন্তু ফিনিস্ত আগের মতোই অঘোর ঘুমিয়ে।

'ওগো ফিনিস্ত, ওগো আমার ঝলমলে বাজ, ওঠ, ওঠ, ঘুম থেকে জাগ!'

ফিনিস্ত কিন্তু ঘুমিয়েই রইল। কিছুতেই জাগল না।

মারুশকা কত চেষ্টা করল তাকে জাগাতে, কিন্তু কিছুতেই পারল না। এদিকে ভোর হয় হয়।

মারুশকা কেঁদে ফেলল। বলল, 'প্রাণের ফিনিস্ত, ওঠ গো চোখ মেলে দেখ, দেখ তোমার মারুশকাকে, বুকে তাকে জড়িয়ে ধরো!'

ফিনিস্তের খোলা কাঁধের ওপর তখন মারুশকার চোখের জল ঝরে পড়ল, সে চোখের জলের ছ্যাঁকা লেগে নড়ে উঠল ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত। চোখ মেলে দেখল—মারুশকা! অমনি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল তাকে। বলল, 'একি সত্যিই তুমি আমার মারুশকা! তুমি তবে তিন জোড়া লোহার জুতো ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙে, তিনটে টুপি ছিঁড়ে সত্যিই এলে? আর কেঁদ না। চলো এবার বাড়ি যাই।'

ওরা বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগল। কিন্তু রানী তা দেখতে পেয়ে হুকুম দিল ঢেঁড়া দিতে, স্বামীর বেইমানি রটিয়ে দিতে।

রাজরাজড়া সওদাগররা সব জড় হল, পরামর্শ করতে লাগল ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে কী দণ্ড দেওয়া যায়।

ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনারাই বলুন আসল বৌ কে? যে আমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সে, না যে আমায় বেচতে চায়, ঠকাতে চায়?'

সবাই তখন মেনে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মারুশকাই তার বৌ।'

তাই সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল তারা। নিজেদের দেশে ফিরে গেল। সেখানে বিয়ের দিন তোপের পর তোপ পড়ল, শিঙার পর শিঙা বাজল আর ভোজটা হল এমন জমকালো যে এখনো লোকে তার কথা ভোলে নি।

সিভ্‌কা-বুর্কা

এক যে ছিল বুড়ো, তার তিন ছেলে। বড় দুই ছেলে চাষবাস দেখত, মাথা উঁচিয়ে চলত, বেশভূষা করত। ছোট ছেলে বোকা ইভান তেমন কিছু নয়। সারাদিন সে বাড়িতে চুল্লির উপরের তাকে বসে কাটাত। আর মাঝে মাঝে বনে যেত ব্যাঙের ছাতা তুলতে।

বুড়োর যখন মরবার সময়, তখন একদিন তিন ছেলেকে ডেকে বললে, 'আমি মরে গেলে পর পর তিন রাত আমার কবরে রুটি নিয়ে আসিস।'

মরে গেল বুড়ো। কবর দেওয়া হল তাকে। সেই রাতে বড় ভাইয়ের কবরে যাওয়ার পালা। কিন্তু বড় ভাইয়ের আলসেমি লাগে, নাকি ভয় পায়। ছোট ভাই বোকা ইভানকে বলে, 'ইভান, আজ যদি তুই আমার বদলে বাবার কবরে যাস, তবে তোকে একটা পিঠে কিনে দেব।'

ইভান তক্ষুনি রাজি। রুটি নিয়ে চলে গেল বাবার কবরে। বসে বসে অপেক্ষা করে। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে বুড়ো বাবা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?' আমার বড় ছেলে নাকি? বল তো শুনি রুশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?'

ইভান বলল, 'বাবা, এই যে আমি, তোমার ছেলে। রুশদেশ শান্তিতে আছে, বাবা!'

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে আবার কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর ইভান পথে থামতে থামতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরতে বড় ভাই জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, বাবাকে দেখলি?'

ইভান বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'রুটি খেল?'

'হ্যাঁ খেল, পেট পুরে।'

আর একটা দিন কেটে গেল। সেদিন মেজ ভাইয়ের যাবার পালা। আলসেমি করেই হোক বা ভয় পেয়েই হোক, মেজ ভাই বলে, 'ইভান, তুই বরং আজ আমার বদলে যা, তোকে একজোড়া লাপ্‌তি বানিয়ে দেব।'

ইভান বলল, 'বেশ।'

রুটি নিয়ে ইভান আবার গেল কবরের কাছে। অপেক্ষা করে বসে রইল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে? আমার মেজ ছেলে নাকি? বল তো শুনি রুশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?'

ইভান জবাব দিল, 'আমি তোমার ছেলে, বাবা। রুশদেশ বেশ শান্তিতেই আছে।'

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পথে থেমে থেমে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাড়ি ফিরল ইভান। বাড়ি ফিরতে মেজ ভাই জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, রুটি খেল বাবা?'

'খেল, পেট পুরে খেল।'

তৃতীয় রাত্তির। সেদিন ইভানের যাবার পালা। ইভান দাদাদের বলল, 'দু'রাত্তির আমি গেছি। আজ তোমরা কেউ যাও। আমি বাড়িতে ঘুমিয়ে নিই।'

দাদারা বলল, 'সে কী রে ইভান, তোর তো বেশ জানা-শোনা হয়ে গেছে, তুই বরং যা।'

'তা বেশ, আমিই যাব।'

রুটি নিয়ে ইভান চলে গেল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা উঠে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে? আমার ছোট ছেলে ইভান নাকি? বল শুনি রুশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?

ইভান জবাব দিল, 'আমি ইভান, বাবা, তোমার ছেলে। রুশদেশ বেশ শান্তিতে আছে।'

বাপ তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে বলল, 'তুই একমাত্র আমার কথা শুনলি। পর পর তিন দিন তিন রাত্তির আমার কবরে আসতে একটুও ভয় পাসনি। এবার এক কাজ কর, খোলা মাঠে গিয়ে চিৎকার করে ডাকবি, 'সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!' ঘোড়াটা তোর সামনে আসবে, তুই ওর ডান কান দিয়ে

ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে আসিস। দেখবি তোর রূপ খুলে যাবে। তারপর ঘোড়ায় চেপে যথা ইচ্ছা তথা যাস।'

বুড়ো বাবা ইভানকে একটা লাগাম দিল। ইভান লাগামটা নিয়ে বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে পথে পথে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরতেই ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, বাবার সঙ্গে দেখা হল?'

ইভান বলল, 'হল।'

'রুটি খেল?'

'পেট পুরে খেল। বলল কবরে আর আসতে হবে না।'

এদিকে হয়েছে কি, রাজা তখন চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছেন—রাজ্যের যত রূপবান, আইবুড়ো, কুমারদের সব তাঁর রাজদরবারে উপস্থিত হওয়া চাই। রাজকন্যার লাবণ্যবতীর জন্যে ওক গাছের বারো খুঁটির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা বানান হয়েছে। সেই কোঠার একেবারে ওপরে রাজকন্যা বসে থাকবেন, আর যে ঘোড়ার পিঠে বসে এক লাফে পৌঁছে রাজকন্যার ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে, রাজা তাকেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাবণ্যবতীকে দেবেন। তা সে যে ঘরের ছেলেই হোক।

ইভানের ভাইয়েদের কানেও একথা পৌঁছতে দেরি হল না। বলল, 'দেখা যাক ভাগ্য পরীক্ষা করে।'

তেজি ঘোড়া দুটোকে ওরা বেশ করে যবের ছাতু খাওয়াল। তারপর নিজেরা ফিটফাট পোশাক পরে, বাবরি চুলটি আঁচড়ে তৈরি হল। ইভান তখন চিমনির পেছনে চুল্লির তাকে বসে। বলল, 'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল না দাদা, আমিও একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে আসি!'

'দূর, হতভাগা, তুই বরং বনে ব্যাঙের ছাতা খুঁজে বেড়া গে যা, লোক হাসিয়ে দরকার নেই!'

বড় দু'ভাই তেজি ঘোড়ায় চড়ে টুপি বাঁকিয়ে, চাবুক চালিয়ে, শিস দিতেই-একরাশ ধুলোর মেঘ আকাশে। ইভান তখন বাবার দেওয়া লাগামটা নিয়ে চলে গেল খোলা মাঠে। তারপর বাবার কথামত ডাকল, 'সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

কোত্থেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। মাটিতে পা গেঁথে বলে, 'বল, কী হুকুম!'

ইভান ঘোড়াটার গলা চাপড়ে নিয়ে তাকে লাগাম পরাল, তারপর তার ডান কান দিয়ে ঢুকে, বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল। আর কী আশ্চর্য! অমনি সে হয়ে গেল এক সুন্দর তরুণ—কী তার রূপ—সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুরীর দিকে রওনা হল ইভান। ছুটল জোড়া কদমে, কাঁপল মাটি সঘনে, পেরিয়ে গিরি কান্তার, মস্ত সে কি ঝাঁপ তার।

ইভান এসে পৌঁছল রাজদরবারে, চারিদিক লোক-লোকারণ্য। বারো খুঁটির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা। তার চিলেকোঠায় জানালার পাশে বসে আছে রাজকন্যা লাবণ্যবতী।

রাজা অলিন্দে বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফিয়ে উঠে আমার মেয়ের ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে, তার সঙ্গেই আমার মেয়ে বিয়ে দেব, আর যৌতুক দেব অর্ধেক রাজত্ব।'

কুমারেরা সবাই তখন এক এক করে এগিয়ে লাফাল, কিন্তু কোথায় কে, জানালার নাগাল কেউ ধরতে পারল না। ইভানের দুই ভাইও চেষ্টা করল, কিন্তু অর্ধেকটা পর্যন্ত গেল না। এবার এল ইভানের পালা।

সিভ্‌কা-বুর্কাকে সে কদমে ছুটিয়ে হাঁক পেড়ে, ডাক ছেড়ে লাফ মারল। কেবল দুটো কুঁদো বাদে সব কুঁদো সে ছাড়িয়ে গেল। ফের আবার ঘোড়া ছুটাল সে। এবারকার লাফে বাকি রইল একটা কুঁদো। ফের ফিরল ইভান, পাক খাওয়ালে ঘোড়াকে, গরম করে তুললো। তারপর আগুনের হল্কার মতো এক প্রচণ্ড লাফে জানালা পেরিয়ে রাজকন্যা লাবণ্যবতীর মধুঢালা ঠোঁটে চুমু খেয়ে গেল ইভান। আর রাজকন্যাও তার হাতের আংটি দিয়ে ইভানের কপালে ছাপ এঁকে দিল।

লোকজনেরা সব 'ধর, ধর'! করে চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু ইভান ততক্ষণে উধাও।

সিভ্‌কা-বুর্কাকে ছুটিয়ে ইভান এল সেই খোলা মাঠে। তারপর ঘোড়ার বাঁ কান বেয়ে উঠে ডান দিয়ে বেরিয়ে এল, আর অমনি সে ফের হয়ে গেল সেই বোকা ইভান। সিভ্‌কা-বুর্কাকে ছেড়ে দিয়ে সে রওনা হল বাড়ির দিকে। যেতে যেতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে নিল। বাড়ি এসে ন্যাকড়া দিয়ে কপালটা বেঁধে চুল্লির উপরের তাকে উঠে শুয়ে রইল।

ভাইয়েরাও যথাসময়ে ফিরে এসে বলতে লাগল, কোথায় গিয়েছিল, কী দেখল।

'খাসা খাসা সব জোয়ান, একজন কিন্তু সবার সেরা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক লাফে উঠে রাজকন্যার ঠোঁটে চুমু খেয়ে গেছে। দেখলাম কোত্থেকে এল, দেখা গেল না কোথায় গেল।'

চিমনির পিছন থেকে ইভান বলে, 'আমি নই তো?'

ভাইয়েরা সে কথা শুনে ভীষণ চটে গেল, 'বাজে বকিস না, হাঁদা কোথাকার! তার চেয়ে চুল্লির উপর বসে বসে ব্যাঙের ছাতা গেল।'

ইভান তখন কপালের পট্টিটা খুলে ফেলল, যেখানে রাজকন্যা ছাপ মেরেছিল আংটি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েঘরটা আলোয় আলোয় ভরে গেল। ভাইয়েরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী, করছিস কী, হাঁদা কোথাকার! ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিবি যে!'

পরদিন রাজবাড়িতে বিরাট ভোজ। পাত্রমিত্র, জমিদার প্রজা, ধনী-গরিব, বুড়ো-বাচ্চা—সকলের নেমন্তন্ন।

ইভানের ভাই দুজনও ভোজে খেতে যাবে বলে তৈরি। ইভান বলল, 'দাদা, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো!'

'কী বললি? তোকে নিয়ে যাব? লোকে হাসবে। তার চেয়ে তুই এখানে চুল্লির উপরে বসে বসে ব্যাঙের ছাতা গেল।'

দু'ভাই তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলে গেল। আর পায়ে হেঁটে ইভান গেল ওদের পেছন পেছন। রাজপুরীতে পৌঁছে দূরে এককোণে বসে রইল ইভান। রাজকন্যা লাবণ্যবতী তখন নিমন্ত্রিতদের প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে। হাতে তার মধুপাত্র। তা থেকে সে এক-একজনকে মধু ঢেলে দেয় আর দেখে কপালে তার আংটির ছাপ আছে কিনা।

সকলকে প্রদক্ষিণ করে এল রাজকন্যা, বাদ রইল কেবল ইভান। ইভানের দিকে রাজকন্যা যত এগোয় তত তার বুক দুরদুর করে। ইভানের সারা গায়ে কালি, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল।

রাজকন্যা লাবণ্যবতী জিজ্ঞেস করে, 'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কপালে তোমার পট্টি বাঁধা কেন?'

ইভান বলল, 'পড়ে গিয়ে কেটে গেছে।'

রাজকন্যা পট্টি খুলে ফেলতেই সারা রাজপুরী আলোয় আলোয় ভরে গেল। রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ তো আমারই ছাপ, একেই তো আমি বরণ করেছি।'

রাজামশাই কাছে এসে বললেন, 'কী যতো বাজে কথা, এ যে একেবারে কালিঝুলি মাখা এক হাঁদা!'

ইভান রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, অনুমতি দিন একবার মুখ ধুয়ে আসি।'

রাজামশাই অনুমতি দিলেন। ইভান উঠোনে গিয়ে বাবার কথামত হাঁক দিল, 'সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

অমনি কোত্থেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। ইভান তার ডান কান দিয়ে ঢুকে, বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল, আর অমনি সে হয়ে গেল সেই রূপবান তরুণ—সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। সব লোকে একেবারে আহামরি করে উঠল।

অমনি সব কথা মিটে গেল, বিয়ের ভোজ চলল ধুমধাম করে।

অ-জানি দেশের না-জানি কী

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজা বিয়ে-থা করে নি, একাই থাকে। তার কাছে এক তীরন্দাজ কাজ করত। তার নাম আন্দ্রেই।

একদিন আন্দ্রেই শিকার করতে গেছে। সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরেও তার কপাল খুলল না, শিকার মিলল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আন্দ্রেই বাড়ি ফিরে চলল। হঠাৎ দেখে, গাছের মাথায় একটা ঘুঘু বসে।

আন্দ্রেই ভাবল, 'ওটাকেই মারা যাক।'

আন্দ্রেই তীর মারল পাখির ডানায়। গাছের উপরে থেকে সোঁদা মাটির উপর পড়ে গেল পাখিটা। আন্দ্রেই তুলে নিয়ে গলা মুচড়ে থলিতে পুরতে যাবে, হঠাৎ পাখিটা মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল।

'মের না, তীরন্দাজ আন্দ্রেই, গলা আমার কেটে ফেল না। জীবন্ত বাড়ি নিয়ে গিয়ে জানালায় রেখে দিও। যেই ঝিমুতে শুরু করব, অমনি তোমার ডান হাত দিয়ে চড় মের আমায়। দেখবে তোমার ভাগ্য কেমন খুলে যায়।'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না আন্দ্রেই : এ কী? দেখতে ঠিক পাখির মতো, আবার মানুষের মতো কথা বলে! আন্দ্রেই পাখিটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে জানালার উপর রেখে দেখতে লাগল কী হয়।

কিছুক্ষণ পরে ঘুঘুটা ডানার তলায় মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুঘুটা কী বলেছিল মনে পড়ল আন্দ্রেই-এর। ডান হাত দিয়ে ঘুঘুটাকে সে চড় মারল। ঘুঘুটা মাটিতে পড়ে হয়ে গেল এক কন্যে, রাজকুমারী মারিয়া। কী তার রূপ, সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়।

রাজকুমারী মারিয়া তীরন্দাজকে বলল, 'হরণ করলে যখন, কর ভরণ পোষণ। ভোজের জন্যে তাড়া নেই, বিয়ে কর। হাসিখুশি সতীলক্ষ্মী বৌ পাবে।'

সেই কথাই ঠিক হল। তীরন্দাজ আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করে দুজনে মনের সুখে থাকতে লাগল। আন্দ্রেই কিন্তু তার কাজ ভোলে না। রোজ সকালে আলো ফুটতে না ফুটতেই বনে গিয়ে বনমোরগ শিকার করে রাজবাড়ির রসুইঘরে দিয়ে আসে।

এইভাবে দিন কাটে। একদিন রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'আমরা বড় গরিবের মতো দিন কাটাচ্ছি আন্দ্রেই।'

'তা ঠিক বলেছ।'

'একশ' রুবল জোগাড় করে আমায় কিছু রেশম কিনে এনে দাও, তাহলে আমাদের অবস্থা ঠিক ফেরাতে পারব।'

রাজকুমারী মারিয়া যা বলল তাই করল আন্দ্রেই। বন্ধুদের কাছে গিয়ে কারও কাছে এক রুবল, কারো কাছে দুই রুবল, এইভাবে একশ' রুবল ধার করে রেশম কিনে বাড়ি ফিরল। রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'এবার শুতে যাও। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

আন্দ্রেই শুতে গেল। বুনতে বসল রাজকুমারী মারিয়া। সারারাত ধরে বুনে মারিয়া এমন একটা গালিচা তৈরি করল, যা পৃথিবীতে কেউ দেখে নি। গালিচার ওপরে গোটা রাজ্যের ছবি আঁকা, শহর-গ্রাম, মাঠ-বনের নকশা তোলা, তার আকাশে পাখি, বনে পশু, সমুদ্রে মাছ, আর সবকিছুর উপর চাঁদের আলো, রবির কিরণ...

সকালবেলা মারিয়া স্বামীকে গালিচাটা দিয়ে বলল, 'সওদাগরদের হাটে গিয়ে বেচে এস। কিন্তু দেখ নিজে মুখে দাম বল না, যা দেবে তাই নিও।'

আন্দ্রেই গালিচা হাতে ঝুলিয়ে চলল সওদাগরদের হাটে।

আন্দ্রেইকে দেখেই তক্ষুনি এক সওদাগর দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কত দাম চাও, ভাই?'

'তুমি সওদাগর, তুমিই বল!'

সওদাগর ভেবে ভেবে আর কিছুতেই দাম বলতে পারে না। তারপর এল আর একজন, আরো একজন, এক এক করে ভিড় জমে গেল সওদাগরের। সকলেই গালিচাটা তাকিয়ে দেখে আর অবাক হয়, কিন্তু কেউ আর দাম বলতে পারে না।

সেই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিল রাজার এক মন্ত্রী। কী ব্যাপার দেখবার জন্যে গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলল, 'আদাব সওদাগরেরা, সাগরপারের মানুষেরা! কী ব্যাপার?

'না, গালিচাটার দাম ঠিক করতে পারছি না।'

রাজার মন্ত্রী তো গালিচাটার দিকে তাকিয়ে হতবাক।

জিজ্ঞেস করল, 'বল তীরন্দাজ, সত্যি করে বল তো, চমৎকার এই গালিচাটা তুমি কোথায় পেলে?'

'না, আমার বৌ বানিয়েছে।'

'কত দাম চাও তুমি?'

'আমি জানি না, বৌ বলে দিয়েছে দরাদরি কর না, যা দেবে তাই নেব।'

'তাহলে এই নাও দশ হাজার।'

আন্দ্রেই টাকা নিয়ে গালিচাটা দিয়ে বাড়ি চলল। মন্ত্রী প্রাসাদে ফিরে গালিচা দেখাল রাজাকে।

নিজের সমস্ত রাজত্বটা চোখের সামনে মেলা দেখে রাজা তো হতভম্ব। আহামরি করে বলে, 'যাই বল মন্ত্রী, তোমাকে আর এ গালিচা ফিরিয়ে দিচ্ছি নে।'

কুড়ি হাজার রুবল রাজা নগদ ধরে দিল মন্ত্রীকে। মন্ত্রী টাকা পেয়ে ভাবল : 'যাক গে। আমি আর একখানা ফরমাস দেব, এর চেয়েও সুন্দর।'

গাড়ি চড়ে মন্ত্রী চলে গেল শহরতলীতে। সেখানে তীরন্দাজ আন্দ্রেই-এর বাড়ি খুঁজে বের করে দরজায় টোকা মারতে লাগল। দরজা খুলে দিল রাজকুমারী মারিয়া। মন্ত্রী এক পা দিল চৌকাঠের ওপারে, কিন্তু অন্য পা তার আর ওঠে না। কথা সরে না মুখে। কী জন্যে এসেছিল সব ভুলে গেল। সামনে তার এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা, রূপ দেখে তার আশা মেটে না।

মন্ত্রী কী বলে শোনার জন্যে রাজকুমারী মারিয়া দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু যখন দেখল মন্ত্রী একটি কথাও বলছে না, তখন মুখ ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সম্বিত ফিরে এল মন্ত্রীর। বাড়ি ফিরে চলল। কিন্তু সেইদিন থেকে মন্ত্রীর খাওয়া দাওয়া গেল ঘুচে। সারাক্ষণ খালি সে তীরন্দাজের বৌয়ের কথা ভাবে।

রাজা বেশ বুঝলে মন্ত্রীর একটা কিছু হয়েছে, তাই একদিন জিজ্ঞেস করল ব্যাপার কী।

'কী আর বলি রাজামশাই, তীরন্দাজের বৌকে দেখে আর কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমায় যেন যাদু করে ফেলেছে, কিছুতেই সে মায়া কাটাতে পারছি না।'

রাজা ভাবল 'আমিও একবার তীরন্দাজের বৌকে দেখে আসি।' সাধারণ জামাকাপড় পরে রাজা গেল শহরতলীতে। আন্দ্রেই-এর বাড়ি খুঁজে বের করে দরজায় টোকা মারল। দরজা খুলে দিল রাজকুমারী মারিয়া। রাজা এক পা বাড়াল চৌকাঠের দিকে, কিন্তু অন্য পা আর তার ওঠে না। মুখে আর কথা সরে না। হাঁ করে রাজা এই অপূর্ব মুখের স্বর্গীয় রূপ দেখতে লাগল।

রাজা কী বলে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল রাজকুমারী মারিয়া, কিন্তু রাজা যখন একটি কথাও বলল না, তখন মুখ ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভীষণ দুঃখ হল রাজার। ভাবল, 'আমিই-বা কেন একা থাকি। এই তো আমার উপযুক্ত এক সুন্দরী কন্যা। এমন মেয়ের রাজরানী হওয়াই সাজে, তীরন্দাজের বৌ নয়।'

প্রাসাদে ফিরে রাজার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি এল—স্বামী বেঁচে থাকতেও বৌ চুরি করে আনবে। মন্ত্রীকে ডেকে বললে, 'একটা উপায় বের কর মন্ত্রী, কী করে ঐ তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে তাড়ান যায়। আমি ওর বৌকে বিয়ে করতে চাই। তুমি যদি

আমায় সাহায্য কর, তবে শহর, গ্রাম, সোনাদানা অনেক কিছু উপহার দেব। আর যদি না কর তবে তোমার গর্দান যাবে।'

মন্ত্রীর ভীষণ ভাবনা হল। মাথা হেঁট করে ফিরে গেল। কিছুতেই আর আন্দ্রেইকে তাড়ানর ফন্দি বের করতে পারে না। মনের দুঃখে মন্ত্রী গেল শুঁড়িখানায় মদ খেতে। শুঁড়িখানার এক নেশাখোর, গায়ে তার ছেঁড়া কাপড় জামা, সে এসে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'মনভার কেন রাজমন্ত্রী, মাথা হেঁট কেন?'

'দূর হ, হতভাগা কোথাকার!'

'আমায় তাড়িয়ে না দিয়ে যদি একটু মদ খাওয়াও, তবে খুব ভালো বুদ্ধি দিতে পারি।'

মন্ত্রী লোকটিকে এক গেলাশ মদ খাইয়ে তার দুঃখের কথা খুলে বলল। লোকটি বলল, 'কাজটি তেমন কঠিন নয়, তীরন্দাজ আন্দ্রেই তো ভারি সরল মানুষ, তবে ওর বৌ ভারি বুদ্ধিমতী। যাক গে, এমন একটা ফন্দি বের করতে হবে যাতে কিছুতেই ও পার না পায়। এক কাজ কর, বাড়ি গিয়ে রাজাকে বল আন্দ্রেইকে হুকুম দিক পরলোকে গিয়ে ও দেখে আসুক রাজামশাইয়ের বাবা বুড়ো রাজা কেমন আছে। আন্দ্রেই একবার গেলে আর ফিরবে না।'

বদমাইশটাকে ধন্যবাদ দিয়ে মন্ত্রী ছুটে গেল রাজার কাছে।

'আন্দ্রেইকে সরিয়ে দেবার একটা উপায় বের করেছি।' বলল কোথায় পাঠাতে হবে তাকে, কী কাজে। রাজা ভীষণ খুশি হয়ে তক্ষুনি তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠাল।

'দেখ আন্দ্রেই, তুমি এতদিন ন্যায়ধর্মে আমার কাজ করেছ। আজ আর একটি কাজ আমার কর। পরলোকে গিয়ে দেখে আসতে হবে আমার বাবা কেমন আছেন। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান...'

আন্দ্রেই বাড়ি ফিরে মন খারাপ করে চৌকিতে বসে রইল।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'মন খারাপ কেন আন্দ্রেই, বিপদ হয়েছে কিছু?'

রাজা কী হুকুম করেছে আন্দ্রেই সব কথা খুলে বলল।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'এ নিয়ে এত ভাবনা? এ আবার কাজ নাকি, এতো নেহাত ছেলেখেলা, আসল কাজই বাকি। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

পরদিন সকালে আন্দ্রেই ঘুম থেকে উঠতেই রাজকুমারী মারিয়া এক থলি শুকনো রুটি আর একটা সোনার আংটি দিয়ে বলল, 'রাজামশাইকে গিয়ে বল, মন্ত্রীকে তোমার সঙ্গে যেতে হবে, তুমি সত্যিই পরলোকে গিয়েছিলে কিনা মন্ত্রী তার সাক্ষী থাকবে। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে সোনার আংটিটা সামনে ছুড়ে ফেলে দিও, আংটি তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে।'

বৌকে বিদায় জানিয়ে শুকনো রুটি আর আংটি নিয়ে আন্দ্রেই রাজার কাছে গিয়ে বলল মন্ত্রীকে সঙ্গে দিতে হবে। রাজা আপত্তি করতে পারল না।

মন্ত্রী আর আন্দ্রেই দুজনে পথে বেরল। আংটিটা গড়িয়ে দিল আন্দ্রেই। খোলা মাঠ, পানা জলা, নদী, হ্রদ পেরিয়ে আন্দ্রেই চলল আংটির পিছু পিছু। আর আন্দ্রেই-এর পিছনে পিছনে কোনোক্রমে আসে রাজার মন্ত্রী।

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওরা কিছু শুকনো রুটি খেয়ে নেয়, তারপর আবার হাঁটা দেয়।

অল্পদূর নাকি অনেকদূর, শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল এক বিজিবিজি গহন বনের মধ্যে। সেখানে এক গভীর খাদের মধ্যে নেমে গেল আংটিটা।

আন্দ্রেই আর মন্ত্রী কিছু শুকনো রুটি খাবে বলে বসল। এমন সময় দেখে কি, বুড়ো থুত্থুড়ে রাজাকে দিয়ে কাঠ বইছে দুই শয়তান। সে কাঠের ভার কী! রাজার দু'দিকে দুই শয়তান বসে লাঠি মেরে মেরে তাকে চালাচ্ছে।

আন্দ্রেই বলল, 'দেখ দেখ, রাজার মরা বাবা না?'

মন্ত্রী বলল, 'তাই তো বটে। এ যে দেখি সে-ই বোঝা বইছে।'

আন্দ্রেই চিৎকার করে শয়তান দুটোকে ডেকে বলল, 'ও মশাইরা! বুড়োটাকে একবার ছেড়ে দাও না, দুটো কথা আছে।'

শয়তানরা বলল, 'আমাদের অত সময় নেই। নিজেরাই আমরা কাঠগুলো বয়ে নিয়ে যাব নাকি?'

'আমি তোমাদের একটা তাজা লোক দিচ্ছি, সে কিছুক্ষণ বুড়োর জায়গায় কাজ করতে পারে।'

এই শুনে শয়তানগুলো বুড়োর ঘাড় থেকে জোয়ালটা খুলে মন্ত্রীর ঘাড়ে পরিয়ে দিল। তারপর লাঠি দিয়ে একজন ডাইনে মারে, একজন বাঁয়ে মারে, কুঁজো হয়ে বোঝা টানতে শুরু করল মন্ত্রী।

আন্দ্রেই তখন বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞেস করল কেমন তার দিন চলছে।

রাজা বলল, 'কী আর বলব, তীরন্দাজ আন্দ্রেই? এ জগতে এসে বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে। ছেলেকে গিয়ে আমার কথা জানিও আর বল, লোকের সঙ্গে যেন খারাপ ব্যবহার না করে, নইলে এখানে এসে তারও দিন যাবে কষ্টে।'

কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই শয়তানগুলো খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। আন্দ্রেই বুড়ো রাজার কাছ থেকে বিদায় নিল। শয়তানদের কাছ থেকে মন্ত্রীকে খালাস করে বাড়ি ফিরে চলল দুজনে।

দেশে পৌঁছে ওরা তো প্রাসাদে গেল। রাজা আন্দ্রেইকে দেখেই ক্ষেপে আগুন। বলল, 'ফিরে এলে যে বড় আচ্ছা আস্পর্ধা তোমার?'

'না, আপনার বাবার সঙ্গে পরলোকে দেখা করে এসেছি। বুড়ো রাজামশাইয়ের বড় কষ্টে দিন কাটছে। আপনাকে আশীর্বাদ জানিয়ে খুব করে বলেছেন, প্রজার উপর যেন অত্যাচার না করেন।'

'সত্যিই যে পরলোকে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেছ তার প্রমাণ কী?'

'আপনার মন্ত্রীর পিঠে শয়তানদের লাঠির দাগগুলো দেখুন।'

মোক্ষম প্রমাণ! রাজা আর কী করে, ছেড়ে দিল আন্দ্রেইকে। আর মন্ত্রীকে ডেকে বলল, 'আন্দ্রেইকে সরিয়ে দেবার উপায় বের কর বাপু, নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

মন্ত্রীর এবার আরো দুশ্চিন্তা। শুঁড়িখানায় গিয়ে মন্ত্রী মদ নিয়ে বসল টেবিলে। অমনি সেই বদমাইশটা এসে হাজির। বলল, 'কিসের এত ভাবনা তোমার, রাজমন্ত্রী? আমায় যদি একটু মদ খাওয়াও তবে আমি ভালো বুদ্ধি বাতলে দিতে পারি।'

মন্ত্রী তখন তাকে এক গেলাশ মদ দিয়ে সব কথা খুলে বলল। নেশাখোরটা বলল, 'রাজাকে গিয়ে বল আন্দ্রেইকে এক কাজ দিতে—এ বাবা জবর কাজ, দিশা পাওয়াই কঠিন, করা তো দূরের কথা। বলবে তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে এক ঘুমপাড়ানী বেড়াল আছে, আন্দ্রেইকে সেটা এনে দিতে হবে...'

রাজমন্ত্রী ছুটে গিয়ে আন্দ্রেইকে সরিয়ে দেবার উপায় বলল রাজাকে। রাজা আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠাল।

'শোন আন্দ্রেই, তুমি আমার একটা কাজ করে দিয়েছ, আর একটা কাজও করে দাও। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে গিয়ে ঘুমপাড়ানী বেড়াল নিয়ে এস আমার জন্যে। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরল আন্দ্রেই। বৌকে বলল রাজা কী কাজ দিয়েছে।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'এ নিয়ে এত ভাবনা? এ তো কাজ নয়, ছেলেখেলা, আসল কাজই বাকি। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

আন্দ্রেই ঘুমুতে গেল। রাজকুমারী মারিয়া তখন কামারের বাড়ি গিয়ে বলল তিনটে লোহার টুপি, একটা লোহার চিমটে আর তিনটে দণ্ড বানিয়ে দিতে—একটা লোহার, একটা তামার আর তৃতীয়টা টিনের।

পরদিন ভোরে রাজকুমারী মারিয়া আন্দ্রেইকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলল, 'এই নাও তিনটে টুপি, একটা চিমটে, আর তিনটে দণ্ড—এবার তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে যাও। ওখানে পৌঁছবার তিন ভার্স্ট আগে তোমার ভীষণ ঘুম পাবে—ঘুমপাড়ানি বেড়াল তোমায় ঘুম পাড়াবে। কিন্তু খবরদার, ঘুমিয়ে পড় না। হাত দিয়ে আড়মোড়া ভাঙবে, পা দিয়ে আড়মোড়া ভাঙবে, মাটিতে গড়াগড়িও দেবে। ঘুমিয়ে পড়লেই কিন্তু বেড়াল মেরে ফেলবে তোমায়।'

কী কী করতে হবে সব বুঝিয়ে বলে আন্দ্রেইকে বিদায় দিয়ে পাঠাল রাজকুমারী মারিয়া।

বলতে এতটুকু কিন্তু করতে এতখানি। তিন দশের রাজ্যে এসে পৌঁছল আন্দ্রেই। ঠিক তিন ভার্স্ট আগে ভীষণ ঘুম পেতে লাগল তার। তখন তিনটে লোহার টুপি মাথায় পরে, হাত দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে, পা দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে এগোয় আন্দ্রেই, দরকার মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নেয়।

কোনোরকমে নিজেকে জাগিয়ে রাখল আন্দ্রেই, এসে পৌঁছল একটা লম্বা থামের কাছে।

ঘুমপাড়ানি বেড়াল আন্দ্রেইকে দেখেই গর্‌র্ গ্‌র্ করে গর্জে উঠে থামের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল আন্দ্রেই-এর মাথার উপর। প্রথম টুপিটা ভেঙে, দ্বিতীয়টা ভেঙে, তৃতীয়টা ভাঙতে যাবে, অমনি আন্দ্রেই বেড়ালটাকে চিমটে দিয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দণ্ড দিয়ে আচ্ছা করে পেটাতে লাগল। প্রথমে মারল লোহার দণ্ড দিয়ে, সেটা ভেঙে যেতে মারল তামার দণ্ড দিয়ে, সেটাও যখন ভেঙে গেল তখন টিনেরটা তুলে নিয়ে পেটাতে লাগল।

টিনের দণ্ডটা বেঁকে যায়, কিন্তু ভাঙে না। কেবল বেঁকে গিয়ে বেড়ালটার গায়ে জড়িয়ে যায়। আন্দ্রেই যত মারে বেড়ালটা তত গল্প শোনায় তাকে—পুরুতদের গল্প,

যাজকদের গল্প, পুরুত বাড়ির মেয়ের গল্প। আন্দ্রেই কিন্তু কোনো কথা না শুনে যত জোরে পারে কেবল মেরেই চলে।

বেড়াল আর পারে না। দেখে তুকতাকে চলবে না, তাই অনুনয়-বিনয় শুরু করল, 'ছেড়ে দাও সুজন, যা বলবে তাই করব।'

'আমার সঙ্গে যাবি?'

'যেখানে বলবে যাব।'

আন্দ্রেই বেড়ালটা নিয়ে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। দেশে ফিরে বেড়ালটাকে নিয়ে গেল রাজার কাছে। বলল, 'তা, হুকুম তামিল করেছি, ঘুমপাড়ানি বেড়াল নিয়ে এসেছি।'

রাজা তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে চায় না। বলল, 'তা ঘুমপাড়ানি বেড়াল. দেখাও দেখি তোমার তেজ!'

বেড়াল অমনি থাবায় শান দেয়, রাজাকে আঁচড়ায়, এই বুঝি রাজার বুক চিরে জ্যান্ত হৃৎপিণ্ডটাই বের করে আনে।

ভয় পেয়ে গেল রাজা, 'থামাও ওকে বাপু তীরন্দাজ আন্দ্রেই।'

আন্দ্রেই বেড়ালটাকে শান্ত করে খাঁচায় পুরল, নিজে ফিরে গেল রাজকুমারী মারিয়ার কাছে। দুটিতে মনের আনন্দেই থাকে। রাজার কিন্তু বুকের মধ্যে আরো বেশি জ্বালাপোড়া। একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বলল, 'যে করে পার, উপায় কর, তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে সরাও। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

রাজমন্ত্রী সোজা গেল শুঁড়িখানায়। ছেঁড়া জামাপরা সেই বদমাইশটাকে খুঁজে বার করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সাহায্য চাইল। বদমাইশটা তার মদের গেলাশ উজাড় করে গোঁফ মুছে বলল, 'রাজামশাইকে গিয়ে বল, আন্দ্রেই অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী নিয়ে আসুক। এ কাজ আন্দ্রেই সারা জীবনেও করতে পারবে না, ফিরেও আর আসবে না।'

ছুটে গিয়ে রাজাকে সব বলল মন্ত্রী। রাজা আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠাল। বলল, 'তুমি আমায় দুটো কাজ করে দিয়েছ, এবার তৃতীয় কাজটাও কর। অ-জানি দেশ থেকে না-জানি-কী-কে নিয়ে এস। যদি পার, রাজার মতো খেলা করব। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

আন্দ্রেই বাড়ি ফিরে চৌকিতে বসে কাঁদতে লাগল।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'কী গো, এমন মনভার কেন গো? আবার কোনো বিপদ নাকি?'

আন্দ্রেই বলল, 'কী আর বলি, তোমার রূপই আমার কাল হল। রাজা হুকুম করেছেন অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী আনতে হবে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা কাজের মতো কাজ! কিন্তু কিছু ভেব না। শোও গে যাও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

রাত হতেই রাজকুমারী মারিয়া খুলে বসল তার যাদুর বই। পড়ে পড়ে তারপর বই ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসল : রাজামশাইয়ের কাজটার কথা বইয়ে কিছুই লেখা

নেই। তখন রাজকুমারী মারিয়া অলিন্দে গিয়ে রুমাল বের করে নাড়তে লাগল। অমনি উড়ে এল যত পাখি, ছুটে এল যত পশু।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'বনের পশু, আকাশের পাখি, বল তো! পশু—তোমরা সব জায়গায় চরে বেড়াও, পাখি—তোমরা সব জায়গায় উড়ে বেড়াও। শোন নি কখনো কী করে অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী আনা যায়?'

পশুপাখির দল বলল, 'না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শুনি নি।'

আবার রুমাল নাড়ল রাজকুমারী মারিয়া। পশুপাখির দল নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজকুমারী তৃতীয়বার রুমাল নাড়তেই এসে দাঁড়াল দুই দৈত্য।

'কী আজ্ঞা, কী হুকুম?'

'বিশ্বাসী দাসেরা আমার, নিয়ে চল আমায় মহাসমুদ্রের মাঝখানে।'

দৈত্য দুটো রাজকুমারী মারিয়াকে ধরে মহাসমুদ্রের ঠিক মাঝখানে নিয়ে গিয়ে গভীর জলে দাঁড়িয়ে পড়ল উঁচু স্তম্ভের মতো। রাজকুমারীকে দুই হাতে তুলে ধরে রাখল জলের ওপর। রাজকুমারী মারিয়া একবার রুমাল নাড়তেই সমুদ্রের যত মাছ, যত প্রাণী সব এসে হাজির।

'সমুদ্দুরের মাছ, সমুদ্দুরের প্রাণী, তোমরা তো সবখানে সাঁতরে বেড়াও, সব দ্বীপে যাও, শোন নি কখনো কী করে অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী আনা যায়?'

'না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শুনি নি।'

মুষড়ে পড়ল রাজকুমারী মারিয়া। দৈত্য দুটোকে বলল বাড়ি নিয়ে যেতে। দৈত্য দুটো তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল বাড়ির অলিন্দে।

পরদিন সকালে আন্দ্রেইকে বিদায় দেবার জন্যে রাজকুমারী মারিয়া তাড়াতাড়ি ঘুম ছেড়ে উঠল। তারপর আন্দ্রেইকে এক সুতোর গোলা আর একটা নকশা কাটা গামছা দিয়ে বলল, 'সামনে এই সুতোর গোলা গড়িয়ে দেবে। ওটা যে দিকে গড়াবে সে দিকে যেও। আর যেখানেই থাক হাত মুখ ধোবার সময় পরের গামছায় মুছ না, আমার গামছায় মুছ।'

আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারদিককে নমস্কার করে শহরের ফটক পার হল। তারপর সুতোর গোলা গড়িয়ে দিল সামনে। সুতোর গোলা গড়ায়, আন্দ্রেইও পিছন পিছন যায়।

বলতে এতটুকু কিন্তু করতে এতখানি। চলতে চলতে আন্দ্রেই কত রাজ্য, কত আজব দেশ পেরিয়ে গেল। সুতোর গোলা গড়াতে গড়াতে ছোট হতে হতে ক্রমে একেবারে মুরগির ডিমের মতো হয়ে গেল। তারপর এত ছোট হয়ে গেল যে আর চোখেই পড়ে না...আন্দ্রেই তখন একটা বনের কাছে এসে দেখে মুরগির পায়ের উপর একটা ছোট কুঁড়েঘর।

আন্দ্রেই বলল, 'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও তো!'

কুঁড়েঘরটা ঘুরে গেল। আন্দ্রেই ঘরে ঢুকে দেখে, এক পাকাচুলো বুড়ি ডাইনি বেঞ্চিতে বসে বসে টাকু ঘোরাচ্ছে।

'হাউমাউখাউ, রুশির গন্ধ পাউ। কখনো চোখে দেখি নি যারে, সে দেখি এল আমার দ্বারে। জ্যান্ত তোকে ভেজে খাব, হাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াব।'

আন্দ্রেই বলল, 'হয়েছে, হয়েছে বুড়ি বাবা-ইয়াগা। হঠাৎ ভবঘুরেকে খাওয়ার সুখ কেন? ভবঘুরের তো কেবল হাড্ডি চামড়াই সার। আগে চানের জল গরম কর, ধোয়াও, চান করাও, তারপর খেও।'

বাবা-ইয়াগা তো আগুন জ্বেলে চানের জল গরম করল। আর আন্দ্রেই গা ধুয়ে বেরিয়ে এল বৌয়ের দেওয়া গামছায় গা মুছতে মুছতে।

বাবা-ইয়াগা জিজ্ঞেস করল, 'এ গামছা তুমি পেলে কী করে? এ যে দেখি আমার মেয়ের হাতের নকশা তোলা।'

'তোমার মেয়েই যে আমার বৌ। সেই আমাকে গামছাটা দিয়েছে।'

'ও তাই নাকি বাছা! এস এস, তুমি যে আমার কত আদরের জামাই!'

বাবা-ইয়াগা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে কত রকম খাবার, কত রকম পানীয়, কত রকমের সব ভালো ভালো জিনিস টেবিলের উপর সাজিয়ে দিল। আন্দ্রেই কোনো ভণিতা না করে বসেই খাবার কাজে লেগে গেল। বাবা-ইয়াগা পাশে বসে বসে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, কী করে আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করল, তারা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে কিনা। আন্দ্রেই সব কথা তাকে জানাল। তারপর রাজা যে তাকে অ-জানি দেশের না-জানি কী আনতে পাঠিয়েছে সে কথাও বলল।

আন্দ্রেই বলল, 'তুমি যদি আমায় একটু সাহায্য করতে বুড়ি।'

'কী আর বলব বাছা, হায় হায়, এমন তাজ্জবের তাজ্জব, আমিও কখনো শুনি নি। এ কথা জানে কেবল এক বুড়ি ব্যাঙ। সে আজ তিনশ' বছর হল জলায় বাস করছে... যাক গে, কিছু ভেব না, শুতে যাও। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

আন্দ্রেই শুয়ে পড়ল আর বাবা-ইয়াগা দুটো বার্চ গাছের ঝাঁটা নিয়ে উড়ে চলে গেল সেই জলার কাছে। সেখানে গিয়ে ডেকে বলল, 'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ বুড়ি ব্যাঙ, বেঁচে আছ।'

'আছি।'

'বেরিয়ে এস জলা থেকে।'

জলার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বুড়ি ব্যাঙ। বাবা-ইয়াগা বলল, 'না-জানি কী কোথায় জান কি?'

'জানি।'

'তাহলে দয়া করে বলে দাও কোথায়। আমার জামাইকে রাজা অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী আনতে পাঠিয়েছেন।'

বুড়ি ব্যাঙ বলল, 'আমি নিজেই তাকে নিয়ে যেতাম, কিন্তু বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছি। অতটা লাফের সাধ্যি নেই। তোমার জামাইকে বল আমায় এক ভাঁড় টাটকা দুধের মধ্যে করে নিয়ে যাক জ্বলন্ত নদীতে। তখন বলব।'

বাবা-ইয়াগা ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ বুড়ি ব্যাঙকে নিয়ে উড়ে এল বাড়ি। এক ভাঁড় টাটকা দুধ দুইয়ে বুড়ি ব্যাঙকে তার মধ্যে রাখল। পরদিন খুব ভোরে আন্দ্রেইকে তুলে দিয়ে বলল, 'তা জামাই, তৈরি হয়ে নাও, টাটকা দুধের ভাঁড়টা ধর, এতে বুড়ি ব্যাঙ আছে। আমার ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও জ্বলন্ত নদীতে। সেখানে ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে বুড়ি ব্যাঙকে ভাঁড় থেকে বের কর। বুড়ি ব্যাঙ তোমায় সব বলে দেবে।'

আন্দ্রেই তৈরি হয়ে ভাঁড়টা হাতে নিল। তারপর বাবা-ইয়াগার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল। অনেক দিন, নাকি অল্প দিন, শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত নদীর কাছে পৌঁছল আন্দ্রেই। সে নদী লাফিয়ে পেরুবে এমন জন্তু নেই, উড়ে যাবে এমন পাখি নেই।

আন্দ্রেই ঘোড়া থেকে নামতে বুড়ি ব্যাঙ বলল, 'এবার বাছা, আমায় ভাঁড় থেকে বের করে নাও। নদী পেরুতে হবে।'

আন্দ্রেই বুড়ি ব্যাঙকে ভাঁড় থেকে বের করে মাটিতে রাখল।

'এবার সুজন, আমার পিঠে চড়ে বস।'

'সেকি দিদিমা, তুমি যে এতটুকু, আমার চাপে পিষে যাবে।'

'ভয় নেই, কিছু হবে না, ভালো করে ধরে থাক।'

বুড়ি ব্যাঙের পিঠে চেপে বসল আন্দ্রেই। ব্যাঙ অমনি নিজেকে ফোলাতে শুরু করল। ফুলতে ফুলতে একটা বিচালির আঁটির মতো বড় হয়ে উঠল ব্যাঙ।

'চেপে ধরেছ তো শক্ত করে?'

'হ্যাঁ দিদিমা, ধরেছি।'

আবার ব্যাঙ ফুলতে শুরু করল। ফুলতে ফুলতে বড় হয়ে গেল একটা বিচালির গাদার মতো।

আবার ফুলতে শুরু করল ব্যাঙ। ফুলতে ফুলতে এবার সে ঘন বনের চেয়েও উঁচু হয়ে গেল। তারপর এক লাফে একেবারে জ্বলন্ত নদীর ওপারে। ওপারে গিয়ে আন্দ্রেইকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে সে আবার আগের মতো ছোটটি হয়ে গেল।

'চলে যাও সুজন, এই পায়ে হাঁটা পথ ধরে, দেখবে এক কোঠা বাড়ি—অথচ কোঠা নয়, কুঁড়েঘর—অথচ কুঁড়ে নয়, চালা—অথচ চালা নয়। গিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে চুল্লীর পিছনে দাঁড়িয়ে থেক। সেখানেই পাবে না-জানি কী।'

পথ ধরে চলল আন্দ্রেই, দেখে, এক পুরনো কুঁড়েঘর, কিন্তু কুঁড়ে নয়। জানালা নেই, অলিন্দ নেই, বেড়া দিয়ে ঘেরা। আন্দ্রেই ভিতরে ঢুকে চুল্লীর পিছনে লুকিয়ে রইল।

একটু পরেই বনের মধ্যে হুড়মুড় ঘড়ঘড় শব্দ। ঘরে এসে ঢুকল এক বুড়ো আঙুলে দাদা, তার দাড়ি শাদা শাদা। ঢুকেই সে চিৎকার করে উঠল, 'ওহে নাউম বেয়াই, খেতে দাও!'

মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই শূন্যি থেকে একটা টেবিল এসে হাজির। টেবিলের ওপর এক পিপে বিয়ার আর একটা রোস্ট করা ধারাল ছুরি বেঁধান আস্ত ষাঁড়। দাড়ি শাদা-শাদা বুড়ো আঙুলে দাদা, ষাঁড়টার সামনে বসে ধারাল ছুরিটা বের করে মাংস কাটে, রসুন ঘষে, খায় দায়, তারিফ করে।

ষাঁড়টার আপাদমস্তক শেষ করল সে, বিয়ারের পিপে খালি করে দিল। বলল : 'ওহে নাউম বেয়াই, এঁটো পরিষ্কার করে নাও!'

অমনি সঙ্গে সঙ্গে হাড়গোড়, বিয়ার পিপেশুদ্ধ কোথায় মিলিয়ে গেল টেবিলটা। বুড়ো আঙুলে দাদা কতক্ষণে বেরিয়ে যায় আন্দ্রেই সেই অপেক্ষায় রইল। তারপর বেরিয়ে যেতেই চুল্লীর পিছন ছেড়ে এসে আন্দ্রেই ভরসা করে ডেকেই ফেলল, 'নাউম বেয়াই, আমায় কিছু খেতে দাও...

কথাটা মুখ থেকে বেরতে না বেরতেই কোত্থেকে যেন একটা টেবিল এসে গেল। আর তার উপর কত রকম খাবার দাবার, মধু মদ।

আন্দ্রেই টেবিলে বসে বলল, 'নাউম বেয়াই, তুমিও বস, একসঙ্গে খাওয়া যাক।'

কাউকে দেখা গেল না, কিন্তু উত্তর এল, 'ধন্যবাদ তোমায় সুজন! কত বছর ধরে এখানে কাজ করছি, কিন্তু কেউ কোনোদিন আমায় একটুকরো পোড়া রুটিও খেতে দেয় নি। আর তুমি আমাকে টেবিলে বসে খেতে ডাকলে!'

আন্দ্রেই তো হতবাক। কাউকে দেখা যাচ্ছে না অথচ খাবারগুলো যেন ঝেঁটিয়ে সাফ হচ্ছে। আপনা থেকেই মদ আর মধুতে গেলাশ ভরে উঠছে। আপনা থেকেই খুটখুট করছে গেলাশ।

আন্দ্রেই বলল, 'নাউম বেয়াই, একবার দেখা দাও না!'

'না, আমাকে তো দেখা যায় না। আমি হলাম না-জানি কী?'

'নাউম বেয়াই, তুমি আমার কাছে কাজ করবে?'

'করব না কেন। দেখছি, লোকটা তুমি ভালো।'

খাওয়া শেষ হলে আন্দ্রেই বলল, 'টেবিলটা পরিষ্কার করে চল আমার সঙ্গে।'

কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আন্দ্রেই আশেপাশে তাকাল।

'নাউম বেয়াই, আছ তো এখানে?'

'হ্যাঁ আছি, ভয় নেই। তোমায় আমি ছেড়ে যাব না।'

হাঁটতে হাঁটতে আন্দ্রেই এসে পৌঁছল জ্বলন্ত নদীর পাড়ে। সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ব্যাঙ।

'কী সুজন, না-জানি কী পেলে?

'পেয়েছি, দিদিমা।'

'তাহলে এবার আমার পিঠে চড়ে বস।'

আন্দ্রেই পিঠে চড়ে বসল আর ব্যাঙ নিজেকে ফোলাতে শুরু করল আবার। তারপর এক লাফে আন্দ্রেইকে জ্বলন্ত নদী পার করে দিল।

আন্দ্রেই ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ বুড়ি ব্যাঙকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের দেশের পথ ধরল। আন্দ্রেই একটু যায় আর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি নাউম বেয়াই, আছ তো?'

'আছি আছি, কোনো ভয় নেই তোমার। ছেড়ে যাব না।'

আন্দ্রেই হাঁটে আর হাঁটে। দূরের পথ। এলিয়ে পড়ে তার সবল পা, নেতিয়ে পড়ে তার ধবল হাত।

বলে, 'ওহ, কী ক্লান্তই না হয়ে পড়েছি!'

নাউম বেয়াই বলল, 'আগে বললে না কেন? আমি তোমায় পলকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দিতাম।'

হঠাৎ একটা ঝড় এসে আন্দ্রেইকে পাহাড়, পর্বত, বন, শহর, গ্রাম পেরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল, এক গভীর সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আন্দ্রেই ভয় পেয়ে বলল, 'নাউম বেয়াই, একটু বিশ্রাম করতে পারলে হতো!'

অমনি থেমে গেল হাওয়া। আন্দ্রেই নামতে লাগল। দেখে কি, যেখানে নীল ঢেউ গজরাচ্ছিল, সেখানে একটা দ্বীপ হয়ে গেছে। সে দ্বীপে এক সোনার ছাদওয়ালা প্রাসাদ

আর তার চারদিক ঘিরে অপরূপ বাগান... নাউম বেয়াই আন্দ্রেইকে বলল, 'বিশ্রাম কর গে, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাও আর সমুদ্রের দিকে নজর রেখ। তিনটে সওদাগরী জাহাজ আসবে। তাদের নেমন্তন্নে ডেক, ভালো করে আপ্যায়ন কর। ওদের কাছে তিনটে আজব জিনিস আছে, চেয়ে নিও। তার বদলে আমায় দিয়ে দিও। ভয় নেই, আমি আবার ফিরে আসব।'

অনেকদিন নাকি অল্প দিন, দেখে কি, তিনটে জাহাজ পশ্চিম থেকে এগিয়ে আসছে। নাবিকরা দেখে একটা দ্বীপ, তার মধ্যে অপরূপ বাগানে ঘেরা সোনার ছাদওয়ালা এক প্রাসাদ।

ওরা বলাবলি করল, 'কী আশ্চর্য! কতবার এই পথে গেছি, নীল ঢেউ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে নি তো। চল জাহাজ তীরে লাগাই!'

জাহাজ তিনটে নোঙর ফেলল। আর তিনজন সওদাগর ডিঙি করে এগিয়ে এল পাড়ের দিকে। তীরন্দাজ আন্দ্রেই আগেই সেখানে অভ্যর্থনার জন্যে হাজির।

'আসুন, আসুন অতিথি সজ্জন।'

সওদাগররা যত দেখে তত অবাক হয়। আগুনের মতো জ্বলছে পুরীর ছাদ। গাছে গাছে পাখির গান, পথে পথে অপরূপ সব প্রাণী।

'বল তো সুজন, কে এখানে এমন আশ্চর্য প্রাসাদ বানাল?'

'আমার চাকর নাউম বেয়াই এসবই বানিয়েছে এক রাতের মধ্যে।'

আন্দ্রেই অতিথিদের নিয়ে গেল পুরীর ভেতরে। বলল, 'ওহে নাউম বেয়াই, আমাদের কিছু খেতে দাও তো!'

হঠাৎ শূন্য থেকে একটা টেবিল এসে দাঁড়াল। আর তার উপর নানা রকম চর্ব্য-চোষ্য-পানীয়। যা মন চায় সব। সওদাগররা একেবারে অবাক। বলল, 'এস আমরা বদলাবদলি করি। তোমার চাকরটিকে আমাদের দাও, তার বদলে আমাদের যে কোনো একটা আজব জিনিস তুমি চাও দেব।'

'বেশ, তা কী কী আজব জিনিস তোমাদের আছে?'

এক সওদাগর জামার নিচ থেকে একটা মুগুর বের করল। কেবল বলতে হবে, 'দে তো মুগুর হাড় গুঁড়িয়ে!' ব্যস, অমনি মুগুর লেগে যাবে কাজে। যত বড়ো পালোয়ানই হোক না কেন, তার হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়বে।

আর এক সওদাগর পোশাকের নিচ থেকে বের করল একটা কুড়ুল। সোজা করে কুড়ুলটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা মাত্রই খটাখট খটাখট ঘা পড়তে লাগল আর তৈরি হয়ে গেল একটা জাহাজ। খটাখট খটাখট—হয়ে গেল আর একটা জাহাজ। একেবারে পাল তোলা, কামান লাগান, মাঝিমাল্লায় ভরা। জাহাজগুলো চলতে শুরু করল, কামানে তোপ পড়ল, মাঝিমাল্লারা হুকুম চাইল।

সওদাগর কুড়ুলটা উল্টে রাখা মাত্র জাহাজ-টাহাজ সব মিলিয়ে গেল। যেন কিছুই ছিল না।

এবার তৃতীয় সওদাগর পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে বাজাতে আরম্ভ করল, অমনি এক দল সৈন্য এসে হাজির : তাদের কেউ সওয়ারী; কেউ পদাতিক, কারো

হাতে বন্দুক, কারো কাছে কামান। কুচকাওয়াজ শুরু হয়ে গেল, তুরীভেরী বেজে উঠল, আকাশে উড়ল পতাকা, ঘোড়সওয়াররা হুকুম চাইল!

সওদাগর তারপর বাঁশির অন্য মুখে ফুঁ দিতেই, ব্যস—ভোঁ ভোঁ, মিলিয়ে গেল সব।

তীরন্দাজ আন্দ্রেই বলল, 'তোমাদের আজব জিনিসগুলো ভালোই, তবে আমারটার দাম আরো বেশি, আমার চাকর, নাউম বেয়াইকে বদলি করতে পারি যদি তোমরা ঐ তিনটে জিনিসই আমায় দিয়ে দাও।'

'একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ভাই?'

'নয়ত বদলি করব না, বুঝে দেখ।'

সওদাগরেরা ভেবে দেখল, 'মুগুর, কুড়ুল, বাঁশি দিয়ে আমাদের কিই-বা হবে? তার বদলে নাউম বেয়াই পেলেই ভালো। রাতে দিনে খাওয়া-দাওয়ার কোনো ভাবনাই থাকবে না।'

সওদাগরেরা আন্দ্রেইকে মুগুর, কুড়ুল, বাঁশি দিয়ে দিল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'ওহে নাউম বেয়াই, আমরা তোমায় নিয়ে যাব। ধম্মমতে কাজ করবে তো?'

আওয়াজ শোনা গেল, 'করব না কেন? যার কাছেই কাজ করি আমার কাছে সবাই সমান।'

সওদাগররা তখন জাহাজে ফিরে গিয়ে ফুর্তি জমাল। খায়, দায়, আর কেবলি হুকুম দেয়, 'নাউম বেয়াই, এই আন, সেই আন!'

খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বেদম মাতাল হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই ঢুকে পড়ল।

ওদিকে তীরন্দাজ আন্দ্রেই প্রাসাদে একা বসে বসে মন খারাপ করে আর ভাবে, 'হায় হায়, কোথায় গেল আমার সেই অনুগত চাকর নাউম বেয়াই?'

'এই যে আমি, কী চাই?'

আন্দ্রেই তো মহা খুশি।

'বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে, ঘরে আমার কচি বৌ! নাউম বেয়াই, এবার বাড়ি নিয়ে চল।'

আবার একটা জোর ঝড় উঠল আর আন্দ্রেইকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল একেবারে তার নিজের দেশে।

এদিকে তো ঘুম থেকে জেগে উঠে সওদাগরদের গা ম্যাজম্যাজ করে, তেষ্টায় ছাতি ফাটে।

'ওহে নাউম বেয়াই, দেখি, কিছু খাবার দাবার এনে দাও তো, একটু চাঙ্গা করে দাও।'

কত হাঁক, কত ডাক, কিছুতেই কিছু হয় না। তাকিয়ে দেখে, দ্বীপ কোথায় মিলিয়ে গেছে। চারদিকে কেবল ফুঁসে উঠছে নীল ঢেউ।

সওদাগররা ভীষণ চটে গেল। 'আচ্ছা বদ লোক তো, আমাদের এমন করে ঠকাল!'

কিন্তু তখন আর উপায় নেই, পাল খাটিয়ে যেদিকে যাবার সেদিকে গেল।

তীরন্দাজ আন্দ্রেই এদিকে দেশে গিয়ে তার কুঁড়েঘরটার পাশে নামল। কিন্তু দেখে কী, কোথায় তার কুঁড়েঘর, একটা পোড়া কালো চিমনি ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই।

দুঃখে মাথা নিচু করে সে শহর ছেড়ে চলে গেল নীল সমুদ্রের ধারে এক বিজন জায়গায়। সেখানে বসে আছে তো আছেই হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এল একটা ঘুঘু। মাটি ছুঁতেই ঘুঘু পাখিটা হয়ে গেল আন্দ্রেই-এর বৌ রাজকুমারী মারিয়া।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে তখন কত কথা, কত কুশল, সব কিছু শুধোয়, সব কিছু বলে।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'যে দিন থেকে তুমি বাড়ি ছেড়ে গেছ, সেদিন থেকে আমি বনে বনে ঝোপে ঝাড়ে ঘুঘু হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। তিন তিন বার রাজা আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। আমায় খুঁজে না পেয়ে বাড়িটাই পুড়িয়ে দিয়েছে।'

আন্দ্রেই বলল, 'নাউম বেয়াই, নীল সমুদ্রের পাড়ে একটা প্রাসাদ তৈরি করে দিতে পার?'

'কেন পারব না? নিমেষের মধ্যেই করে দিচ্ছি।'

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রাসাদ একেবারে তৈরি। আর সে কী জমকালো প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের চেয়েও ঢের ভালো। চারদিকে সবুজ বাগান। গাছে গাছে পাখির গান, পথে পথে কত অপরূপ প্রাণী।

তীরন্দাজ আন্দ্রেই আর রাজকুমারী মারিয়া ঢুকল প্রাসাদে। জানালার পাশে বসে তারা দুঁহু দোঁহা গল্প করে, দেখে দেখে আর আশ মেটে না। এইভাবে মহা আনন্দে দিন কাটে, একদিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন যায়।

রাজা ওদিকে শিকার করতে গিয়ে দেখে, নীল সমুদ্রের ধারে আগে যেখানে কিছু ছিল না, সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ।

'আমার অনুমতি না নিয়ে কোন হতভাগা আমারই জমিতে বাড়ি তুলেছে?'

তক্ষুনি দূত ছুটল। খোঁজ-খবর নিয়ে জানাল সেই যে তীরন্দাজ আন্দ্রেই, সে এই প্রাসাদ বানিয়ে তার বৌ রাজকুমারী মারিয়াকে নিয়ে বসবাস করছে।

রাজা গেল আরো ক্ষেপে। দূত পাঠাল খবর আনতে সত্যিই আন্দ্রেই অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী এনেছে কিনা।

আবার দূত ছুটল। ফিরে এসে খবর দিল : 'হ্যাঁ মহারাজ, আন্দ্রেই সত্যিই অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী নিয়ে এসেছে।'

এই কথা শুনে তো রাজা একেবারে রেগে আগুন, তেলে বেগুন। তক্ষুনি সৈন্য সামন্ত ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিল সমুদ্র তীরে গিয়ে আন্দ্রেই-এর প্রাসাদ যেন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়। তীরন্দাজ আন্দ্রেই আর রাজকুমারী মারিয়াকে যেন হত্যা করা হয় নিষ্ঠুরভাবে।

আন্দ্রেই দেখে, প্রবল এক সৈন্যবাহিনী তাকে আক্রমণ করতে আসছে। তক্ষুনি সে কুড়ুলটা টেনে নিয়ে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। কুড়ুল চলল খটাখট খটাখট—অমনি জাহাজ ভাসল সমুদ্রে। খটাখট খটাখট—অমনি আর একটা জাহাজ। একশ' বার কুড়ুল চলল, একশ' জাহাজ পাল তুলে দাঁড়াল সমুদ্রে।

আন্দ্রেই বাঁশিটা বের করে বাজাতেই হাজির হল সৈন্যদল। তাদের কেউ সওয়ারী, কেউ পদাতিক, কারো হাতে বন্দুক, কারো কাছে কামান, কারো কাছে নিশান।

সেনাপতিরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, হুকুমের জন্যে দাঁড়ায়। আন্দ্রেই হুকুম দিল যুদ্ধ শুরু কর। অমনি তুরীভেরী কাড়া-নাকাড়া রণবাদ্য বেজে উঠল। এগোতে শুরু করল সৈন্যদল। পদাতিকরা ছারখার করে রাজসৈন্য। ঘোড়সওয়াররা ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দি করতে থাকে। একশ' জাহাজের কামান থেকে গোলা ছোটে।

রাজা দেখল, সৈন্যরা তার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে। নিজেই ছুটল তাদের থামাতে। আন্দ্রেই তখন তার মুগুরটা বের করে বলল, 'দে মুগুর রাজার হাড় গুঁড়িয়ে!'

অমনি মুগুর তিড়িং লাফে মাঠ পেরিয়ে ধেয়ে গেল। রাজাকে ধরে ফেলে তার কপালে এমন এক ঘা কষিয়ে দিল যে রাজা সেখানেই লুটিয়ে পড়ল প্রাণ হারিয়ে।

অমনি যুদ্ধ থেমে গেল। শহরের সব লোক শহর থেকে বেরিয়ে এসে তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে তাদের রাজা হবার জন্যে মিনতি করতে লাগল।

আন্দ্রেই আপত্তি করল না। বিরাট এক ভোজ দিয়ে রাজকুমারী মারিয়াকে নিয়ে সারা জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাজত্ব করতে লাগল সে।

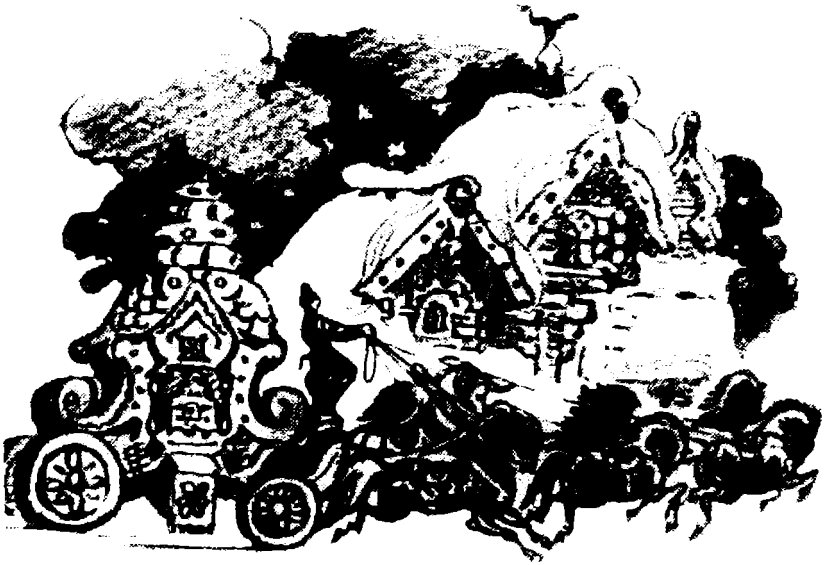

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান

অনেককাল আগে ছিল এক বুড়ো আর বুড়ি। বুড়ো রোজ পশুপাখি মেরে আনত। সেই খেয়েই বেঁচে থাকত। বয়স অনেক হল, কিন্তু ধনসম্পদ নেই। বুড়ি তাই নিয়ে রোজ দুঃখ করত, ঘ্যান ঘ্যান করত, 'সারা জীবন কেটে গেল, না পেলাম একটা ভালো কিছু খেতে, না পেলাম ভালো কিছু পরতে। ছেলেপুলেও নেই যে বুড়ো বয়সে আমাদের দেখাশোনা করে।'

বুড়ো সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'দুঃখ কর না বুড়ি, দুঃখ কর না। যতদিন আমার এই দুটো হাত আর দুটো পা আছে, ততদিন খাওয়া জোটাব। তার পরের কথা ভেবে কী হবে।'

এই বলে বুড়ো চলে গেল শিকারে।

সেদিন সকাল থেকে রাত অবধি বুড়ো বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু একটা পাখি পশু কিছুই মারতে পারল না। খালি হাতে বাড়ি ফিরতে মন চাইছিল না। কিন্তু উপায় নেই। ওদিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে—বাড়ি ফেরার সময় হল।

বুড়ো যেই বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, অমনি ডানার আওয়াজ শোনা গেল। ঝোপ থেকে মাথা তুলল অপূর্ব সুন্দর একটা বড়মতো পাখি।

কিন্তু নিশানা ঠিক করতে করতেই উড়ে পালিয়ে গেল পাখিটা।

'দেখা যাচ্ছে কপালে নেই!'

যে ঝোপ থেকে পাখিটা বেরিয়ে এসেছিল বুড়ো সেখানে উঁকি দিয়ে দেখে একটা বাসা, তাতে তেত্রিশটা ডিম।

'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো,' এই বলে বুড়ো তার কোমরের বাঁধুনিটা এঁটে নিয়ে তেত্রিশটা ডিমই তার পোশাকের মধ্যে পুরে বাড়িমুখো রওনা দিল।

চলতে চলতে বুড়োর কোমরের বাঁধুনি কখন গেল আলগা হয়ে, আর ডিমগুলো সব ফাঁক দিয়ে পড়ে যেতে লাগল।

একটা করে ডিম পড়ে, আর তার ভিতর থেকে একটি করে তরুণ বেরিয়ে আসে। এমনি করে করে বত্রিশটা ডিম পড়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বত্রিশটি তরুণ।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বুড়ো তার কোমরের বাঁধুনিটা এঁটে দেওয়ায় তেত্রিশ নম্বর ডিমটা আর পড়ল না। বুড়ো তারপর যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে—একেবারে অবাক কাণ্ড, দেখে কি, বত্রিশটি সুকুমার তরুণ তার পিছন পিছন আসছে, চোখে মুখে গড়নে চলনে একেবারে হুবহু এক। ছেলের দল সমস্বরে বলে উঠল, 'তুমি যখন আমাদের খুঁজে পেয়েছ, তখন তুমিই আমাদের বাবা, আমরা তোমার ছেলে, বাড়ি নিয়ে চল আমাদের।'

বুড়ো ভাবল, 'বুড়োবুড়ি আমাদের একটি ছেলেও ছিল না, আর আজ একেবারে একসঙ্গে বত্রিশটি!'

সবাইকে নিয়ে বাড়ি এসে বুড়ো ডাকল, 'বুড়ি, ও বুড়ি! এতদিন তো খালি ছেলে ছেলে করে দুঃখ করতে। এই নাও বত্রিশটি ফুটফুটে ছেলে। জায়গা কর, ছেলেদের খাওয়াও।'

বুড়ো বুড়িকে সব ঘটনা খুলে বলল।

বুড়ি তো সেখানেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দিয়ে রা বেরল না। গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারপর হঠাৎ ছুটল খাবার জায়গা করতে। বুড়ো ওদিকে কোমরের বাঁধুনিটা খুলে যেই পোশাকটা ছাড়তে গেছে, অমনি তেত্রিশ নম্বর ডিমটা গেল পড়ে আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আর একটি তরুণ।

'আরে, তুমি আবার কোথা থেকে এলে?'

'আমিও তোমার ছেলে, ক্ষুদে ইভান।'

তখন বুড়োর মনে পড়ল সত্যিই তো সে পাখির বাসায় তেত্রিশটা ডিমই পেয়েছিল।

'ঠিক আছে, ক্ষুদে ইভান, তুমিও তবে খেতে বসে যাও।'

তেত্রিশটি ছেলে কিন্তু খেতে বসামাত্রই বুড়ির ভাঁড়ারে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেল, টেবিল ছেড়ে উঠতে হল ভরপেটেও নয়, খালি পেটেও নয়।

রাত কাটাল ছেলেরা। পরদিন সকালে ক্ষুদে ইভান বুড়োকে বলল, 'বাবা, আমাদের নিয়ে যখন এসেছ, কাজও দাও।'

'কিন্তু কী করে দিই? বুড়োবুড়ি আমরা, জীবনে কখনো না দিয়েছি হাল, না বুনেছি বীজ। আমাদের না আছে ঘোড়া, না আছে লাঙল।'

ক্ষুদে ইভান বলল, 'নেই, তো নেই! কী আর করা যাবে। লোকের কাছে গিয়ে কাজ করব। বাবা, তুমি কামারের কাছে গিয়ে আমাদের জন্যে তেত্রিশটা কাস্তে গড়িয়ে আন।'

বুড়ো গেল কামারের কাছে কাস্তে গড়াতে, আর এদিকে ক্ষুদে ইভান আর তার ভাইয়েরা মিলে ততক্ষণে বানিয়ে ফেলল তেত্রিশটা কাস্তের হাতল আর তেত্রিশটা আঁচড়া।

বুড়ো কামারঘর থেকে ফিরে এলে ক্ষুদে ইভান সবাইকে যন্ত্রপাতি বেঁটে দিয়ে বলল, 'চল যাই মজুর খাটব, রোজগার করব, নিজেদের পেট চালাতে হবে, বাবা-মাকেও দেখতে হবে।'

তারপর বুড়ো বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভাইয়েরা। গেল তারা একটুখানি নাকি অনেকখানি, অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, দেখল সামনে একটা মস্ত শহর। সেই শহর থেকে তখন রাজার গোমস্তা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। ওদের দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে জোয়ানেরা, কাজ করতে যাচ্ছ, নাকি কাজ থেকে ফিরছ? যদি খাটতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এস, ভালো কাজ আছে।'

ক্ষুদে ইভান জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কাজটা কী, বলবে।'

গোমস্তা বলল, 'তেমন কঠিন কিছু নয়। রাজার খাস মাঠের ঘাস তোমাদের কেটে, শুকিয়ে, আঁটি বেঁধে, গাদা করে রাখতে হবে। তোমাদের সর্দার কে?'

কেউ উত্তর দিল না। ক্ষুদে ইভান এগিয়ে এসে বলল, 'চল, কাজ বুঝিয়ে দাও।'

গোমস্তা তখন তাদের রাজার খাস মাঠে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তিন সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে তো?'

ইভান বলল, 'যদি ঝড় জল না হয়, তবে তিন দিনেই হয়ে যাবে।'

সে কথায় গোমস্তা ভারি খুশি হয়ে বলল, 'তবে কাজে লেগে যাও, মজুরি ঠকাব না, খোরাক যা লাগবে সব পাবে।'

ক্ষুদে ইভান বলল, 'আমাদের আর কিছুই চাই না, কেবল তেত্রিশটা ষাঁড়ের রোস্ট, তেত্রিশ বালতি মদ, আর প্রত্যেককে একটা করে কালাচ দিও, তাতেই হবে।'

গোমস্তা চলে গেল। তেত্রিশ ভাই কাস্তেতে শাণ দিয়ে এমন ফুর্তিতে টান লাগাল যে আওয়াজ উঠল শনশন। কাজ চলল খুব জোর। সন্ধ্যার মধ্যেই সব ঘাস কাটা হয়ে গেল। এদিকে রাজার রসুইঘর থেকে এল তেত্রিশটি ষাঁড়ের রোস্ট, তেত্রিশ বালতি মদ আর প্রত্যেকের একটা করে কালাচ। তেত্রিশ ভাই প্রত্যেকে আধখানা করে ষাঁড়, আধ বালতি করে মদ, আর আধখানা করে কালাচ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন চন্‌চনে রোদ উঠলে তেত্রিশ ভাই ঘাসগুলো শুকিয়ে আঁটি বেঁধে সন্ধ্যার মধ্যেই গাদা দিয়ে ফেলল। তারপর আবার তারা প্রত্যেকে আধখানা করে কালাচ দিয়ে আধখানা করে ষাঁড় আর আধ বালতি মদ খেল। তারপর ক্ষুদে ইভান তার এক ভাইকে পাঠিয়ে দিল রাজদরবারে।

বলল, 'বল গিয়ে আমাদের কাজ দেখে যাক।'

গোমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরল। পিছু পিছু রাজামশাইও তার মাঠে এসে হাজির। প্রত্যেকটি গাদা গুনে গুনে মাঠের সবটা ঘুরে ঘুরে দেখল রাজা—একটি ঘাসের শিষও কোথাও নেই। বলল, 'চটপট আমার খাস জমির ঘাস কেটে বিচালি বানিয়ে গাদা দিয়েছ তোমরা ভালোই। এর জন্যে তোমাদের বাহবা দিচ্ছি, তাছাড়া দিচ্ছি একশ'টি রুবল আর চল্লিশ-ভাঁড়ী মদের পিপে। কিন্তু আর একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। এই বিচালি পাহারা দাও। প্রত্যেক বছর কে এসে যেন এসব বিচালি খেয়ে যায়, কিছুতেই চোরকে ধরতে পারছি না।'

ক্ষুদে ইভান বলল, 'হুজুর মহারাজ, আমার ভাইয়েদের আপনি বাড়ি যেতে দিন, আমি একাই পাহারা দেব।'

রাজার তাতে আপত্তি হল না। ভাইয়েরা সব রাজদরবারে গিয়ে তাদের পাওনা টাকা নিয়ে ভালো পানাহার করে বাড়ি ফিরল।

ক্ষুদে ইভান ফিরে গেল রাজার সেই খাস মাঠে। রাত্তিরে সে না ঘুমিয়ে রাজার বিচালি পাহারা দেয়। আর দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া করে জিরিয়ে নেয় রাজার রসুইঘরে।

দেখতে দেখতে হেমন্তকাল এসে গেল। রাত্তিরগুলো তখন বড় বড় আর অন্ধকার। একদিন এক সন্ধ্যায় ক্ষুদে ইভান একটা বিচালির গাদায় খড় জড়িয়ে শুয়ে আছে, চোখে ঘুম নেই। ঠিক রাত দুপুরে চারিদিক হঠাৎ যেন দিনের আলোয় ভরে গেল। ক্ষুদে ইভান মাথা বের করে দেখে কী, স্বর্ণকেশরী একটা মাদী ঘোড়া। ঘোড়াটা সমুদ্রের বুক থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা ছুটে এল বিচালির গাদার দিকে। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, সোনালি কেশর হাওয়ায় ওড়ে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়।

ঘোড়াটা এসেই বিচালি খেতে লেগে গেল। পাহারাদার ক্ষুদে ইভান সুযোগ বুঝেই লাফিয়ে পড়ল ঘোড়াটার পিঠে। বিচালির গাদা ছেড়ে রাজার খাস মাঠের মধ্যে দিয়ে তখন সে কী ছুট ঘোড়াটার। ক্ষুদে ইভান বাঁ হাতে ধরেছে ঘোড়ার কেশর, ডান হাতে চামড়ার চাবুক। চাবুক মেরে মেরে জলায় শ্যাওলায় ঘোড়াকে ছোটাতে লাগল ক্ষুদে ইভান।

জলায় শ্যাওলায় ছুটে ছুটে শেষে পেট পর্যন্ত পাঁকের মধ্যে ডুবে গিয়ে থামল ঘোড়াটা। বলল, 'ক্ষুদে ইভান' আমায় তুমি ধরেছ, সওয়ার হয়ে থেকেছ, বশে আনতেও পেরেছ। আর আমায় মের না, কষ্ট দিও না, আজ থেকে আমি তোমার সব কথা শুনব।'

ক্ষুদে ইভান তখন ঘোড়াটাকে নিয়ে রাজার আস্তাবলে বেঁধে রেখে নিজে গিয়ে রসুইঘরে ঘুমিয়ে রইল। পরদিন ইভান রাজাকে গিয়ে বলল, 'হুজুর মহারাজ, আপনার খাস মাঠ থেকে বিচালি চুরি কে করত আমি বের করেছি। চোরটাকেও ধরেছি। চলুন দেখবেন।'

স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে দেখে রাজা তো ভীষণ খুশি।

বলল, 'তা ইভান, হলে কী হয় ক্ষুদে ইভান, আসলে বড় বুদ্ধিমান; আমার ভালো কাজের জন্যে আজ থেকে তোমায় আমি আমার প্রধান সহিস করে দিলুম।'

সেই থেকে ছেলের নাম হয়ে গেল ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান।

ক্ষুদে ইভান রাজার আস্তাবলে কাজ করতে লাগল। সারারাত না ঘুমিয়ে সে রাজার ঘোড়ার দেখাশোনা করে। তার ফলে রাজার ঘোড়াগুলোর দিনে দিনে চেকনাই বাড়ল আর পুরুষ্টু হয়ে উঠল। গা তাদের রেশমের মতো চকচক করে, লেজ দুলিয়ে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়—সত্যিই দেখবার মতো।

রাজামশাই ভারি খুশি। প্রশংসা আর ধরে না।

'বাহবা, ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান! এমন সহিস আমি জীবনে দেখি নি।'

কিন্তু আস্তাবলের পুরোনো সহিসদের হিংসে হল।

'কোথাকার একটা গেঁয়ো ভূত এসে বসেছে আমাদের উপর। রাজার আস্তাবলের প্রধান সহিস হবে কিনা ওই লোকটা?'

সবাই মিলে ওরা ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল। ক্ষুদে ইভান কিন্তু নিজের কাজ করে চলে। কোনো কিছুই টের পেল না।

একদিন এক নেশাখোর চৌকিদার এল রাজার আস্তাবলে।

বলল, 'এক ঢোক মদ দাও তো হে। কাল রাত থেকে মাথাটা বড় ধরে আছে। যদি মদ খাওয়াও তবে তোমাদের এই প্রধান সহিসের হাত থেকে ছাড়া পাবার ফন্দি বাতলে দেব।'

এই কথা শুনে সহিসরা সানন্দে ওকে মদ খাওয়াল। চৌকিদার তার মদের পাত্র শেষ করে বলল, 'আমাদের রাজামশাইয়ের ভারি ইচ্ছে, আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল জোগাড় করেন। এই আজব জিনিসের খোঁজে কত ভালো ভালো জোয়ান গেছে নিজে থেকে, আরো কত গেছে বাধ্য হয়ে, কিন্তু তাদের একজনও আর ফিরে আসে নি। তোমরা এক কাজ কর, রাজামশাইকে গিয়ে বল যে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বড়াই করে বলেছে যে সে অনায়াসে এইসব জিনিস এনে দিতে পারে। রাজা তখন ওকেই পাঠাবেন, তাহলে আর কোনোদিনই সে ফিরে আসবে না।'

পুরনো সহিসরা চৌকিদারকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আর এক পাত্র মদ খাওয়াল। তারপর চলে গেল একেবারে সোজা রাজবাড়ির সদর অলিন্দের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা রাজার ঘরের জানালার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করতে লাগল। দেখতে পেয়ে রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলাবলি করছ হে? কী চাও, কী?'

'না মহারাজ, বিশেষ কিছুই না, তবে প্রধান সহিস ক্ষুদ্র ইভান বড় বুদ্ধিমান বড়াই করে বলছিল যে সে আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দিতে পারে। সেই নিয়েই আমাদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল, কেউ বলছিল আনতে পারবে, কেউ বলছিল কেবল বরফট্টাই।'

এই কথা শুনে রাজামশাইয়ের মুখের চেহারাই বদলে গেল; হাত পা কাঁপতে লাগল। ভাবল, 'আঃ, যদি একবার এই দুর্লভ জিনিসগুলো পাই, তবে সব রাজা আমায় হিংসে করবে। কত লোককে পাঠালাম কিন্তু একজনও ফিরে এল না!'

তক্ষুনি রাজা প্রধান সহিসকে ডেকে পাঠাল।

প্রধান সহিস আসামাত্রই চেঁচিয়ে উঠল রাজা, 'দেরি কর না ইভান, বেরিয়ে পড়, আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দাও।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলল, 'কি বলছেন মহারাজ, আমি তো এসব জিনিসের নাম কোনোদিন কানেও শুনি নি, যাব কোথায়?'

রাজামশাই তা শুনে রেগে উঠে মাটিতে পা ঠুকে বলল, 'কী, রাজার কথার ওপর কথা! যদি আনতে পার তবে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে, আর যদি না পার তবে গর্দান যাবে।'

মনের দুঃখে উঁচু মাথা নিচু করে ফিরে এল ক্ষুদে ইভান। এসে তার সেই স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে লাগাম পরাতে লাগল। ঘোড়া জিজ্ঞেস করল, 'কী কর্তা, মন খারাপ কেন, বিপদ কিছু হয় নি তো?'

'মন খারাপ না করে কী করি বল, রাজা বলেছেন আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দিতে হবে। আমি তো কোনোদিন তাদের কথা কানেও শুনি নি।'

স্বর্ণকেশরী ঘোড়া বলল, 'এ আর এমন কী ব্যাপার, আমার পিঠে চড়ে বস, ডাইনি বুড়ি বাবা-ইয়াগার কাছে গিয়ে জেনে নেব, এসব আজব জিনিস কোথায় পাওয়া যেতে পারে।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তাই তখন দূরপাল্লায় পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হল। ঘোড়ায় উঠতে দেখা গেল, কিন্তু দেখাই গেল না তার ছুটে যাওয়া।

গেল সে অল্প পথ নাকি অনেক পথ, অল্প দিন নাকি অনেক দিন, এল এক গহন বনের মধ্যে, এমন আঁধার, দিনের আলো ঢুকতে পায় না। ঘুরতে ঘুরতে স্বর্ণকেশরী ঘোড়া তার রোগা হয়ে গেল, ক্ষুদে ইভান নিজেও কাহিল। বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় আসতেই দেখে এক মুরগির পা, পায়ের গোড়ালির বদলে একটা টাকু আর সেই পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরটা পুব থেকে পশ্চিমে পাক খাচ্ছে। ক্ষুদে ইভান কুঁড়েঘরটার কাছে গিয়ে বলল, 'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। থাকতে আসি নি চিরকাল, রাত পোয়ালে যাব কাল।'

কুঁড়েঘর ইভানের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। ক্ষুদে ইভান তার ঘোড়াটাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এক ধাক্কায় দরজা খুলল। খুলে দেখে কী, না বাবা-ইয়াগা খেংরাকাঠি পা, খাঁড়ার মতো বেঁকে নাকটা ছাতে ঠেকে, হামানদিস্তা পাশে, বুড়ি মিটিমিটি হাসে।

বাবা-ইয়াগা অতিথিকে দেখে খনখনিয়ে উঠল, 'কতদিন যে শুনি নি কানে, আজ দেখি রুশী মোর এখানে, বল তো কিসের জন্যে এসেছ!'

'দিদিমা, এই কি তোমার অতিথি সৎকারের ধারা? খিদেয় ঠাণ্ডায় যে মরছে আগেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ? আমার রুশ দেশে অতিথি এলে আগে তাকে খাইয়ে দাইয়ে স্নান করতে দেয়। জিরোতে বলে, তারপর নামধাম, কেন, কী, সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে।'

'বাবা রে বাবা, আমি বুড়ি মানুষ, রাগ কর না বাছা। এদেশটা তো আর রাশিয়া নয়। দাঁড়াও বাবা, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বুড়ি তাড়াতাড়ি সব জোগাড়যন্ত্র করতে লাগল। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাবার সাজাল টেবিলে, অতিথিকে ডেকে বসাল। তারপর দৌড়ে গেল চানের ঘরে চুল্লি জ্বালাতে। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান খুব আরাম করে গরম জলে চান করে নিল। বাবা-ইয়াগা বিছানা পেতে দিল, শোয়ালে ইভানকে, তখন বিছানার পাশে বসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বল তো সুজন? নিজের ইচ্ছেয় এসেছ, নাকি অনিচ্ছায় আসতে হয়েছে? কোথায় যাবে?'

ইভান বলল, 'রাজামশাই আমায় পাঠিয়েছেন আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল আনতে। এগুলো কোথায় পাওয়া যায় যদি বলে দাও দিদিমা, তবে চিরকাল তোমার গুণ গাইব।'

'ওগুলো কোথায় আছে, সে তো জানি বাছা, কিন্তু পাওয়া যে ভারি শক্ত। কত কুমার আনতে গেল, কিন্তু তাদের কেউ ফেরে নি।'

'কিন্তু দিদিমা, যা হবার তা হবেই! বরং আমায় সাহায্য কর, কোথায় যাব বলে দাও।'

'আহা বাছা রে, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। দেখি তোমায় একটু সাহায্য করে। স্বর্ণকেশরীকে রেখে যাও, আমার কাছে সে ভালোই থাকবে। আর এই সুতোর গোলা নাও। কাল বেরবার সময় এই সুতোর গোলাটাকে মাটিতে ফেলে দিও, তারপর সুতোর গোলা যে দিকে গড়িয়ে যাবে সেদিকে যেও। এইভাবে তুমি আমার মেজো বোনের কাছে গিয়ে পৌঁছবে। সুতোর গোলা তাকে দেখালেই সে যা সন্ধান জানে বলে দিয়ে তোমায় সাহায্য করবে, তোমাকে আমাদের বড়ো বোনের কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

পরের দিন বুড়ি তার অতিথিকে ভোর হবার আগেই তুলে দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে এগিয়ে দিল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ধন্যবাদ দিয়ে দূরের পথে পাড়ি দিল। বলতে সহজ কিন্তু করতে কঠিন। যাই হোক, সুতোর গোলাটা গড়িয়েই চলে আর ক্ষুদে ইভান চলে তার পিছন পিছন।

এক দিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায়, শেষকালে গোলাটা এসে থামল এক চড়াইয়ের পায়ের কাছে। পায়ের গোড়ালির বদলে একটা টাকু আর সেই পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ডেকে বলল, 'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও।'

সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েঘর ঘুরে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই ইভান শুনতে পেল হেঁড়ে গলার আওয়াজ, 'কতদিন যে শুনি নি কানে, রুশির গন্ধ পাই নি, মানুষের মাংস খাই নি। মানুষ আজ যে নিজেই হাজির। কী চাই তোমার?'

ক্ষুদে ইভান সুতোর গোলাটা দেখাতেই সে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'আরে আরে, তুমি তো দেখি আমার বোনের কাছ থেকে আসছ, তবে তো তুমি পর নও, আদরের অতিথি। আগে বললেই পারতে।'

তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি লাগাল বুড়ি। আর যত রাজ্যের ভালো ভালো খাবার মদ এনে টেবিল সাজিয়ে অতিথিকে ডেকে বসাল।

বুড়ি বলল, 'আগে খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে নাও, তারপর কাজের কথা হবে।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তো পেট পুরে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে জিরোতে লাগল। আর বাবা-ইয়াগার মেজো বোন তার বিছানার পাশে বসে জিজ্ঞেস করতে লাগল সব বৃত্তান্ত। কে সে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে; সব কথা তাকে বলল ক্ষুদে ইভান। শুনে-টুনে বাবা-ইয়াগা বলল,

'পথ তো বেশি দূরের নয়, তবে জানি না তুমি শেষপর্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকবে কিনা। নাগ জ্‌মেই গরীনীচ হল আমাদের বোন-পো। আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল সব তারই সম্পত্তি। কত তরুণ কুমার গেছে, কিন্তু কেউ ফিরে আসে নি। সবাই নাগের হাতে মারা পড়েছে। এই নাগ আমার দিদির ছেলে। এই কাজে এখন দিদির সাহায্য চাই, নয় তো বাছা তুমিও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। আজ আমার জাদু দাঁড়কাককে পাঠাব, দিদিকে আগেই সাবধান করে দিতে হবে। যা হোক, এখন তুমি ঘুমোও, কাল খুব ভোরে ডেকে দেব।'

রাতটা ঘুমাল ক্ষুদে ইভান, ভোর বেলা উঠে হাত-মুখ ধুল। বাবা-ইয়াগা তাকে খাইয়ে দাইয়ে হাতে একটা লাল পশমের গোলা দিয়ে পথ দেখিয়ে বিদায় নিল। গোলা চলল গড়িয়ে আর ইভান চলল তার পিছন পিছন।

সকাল থেকে সন্ধ্যে আর সন্ধ্যে থেকে সকাল—ইভান হেঁটেই চলেছে। ক্লান্ত হয়ে ইভান পশমের গোলাটা হাতে তুলে নিয়ে একটুকরো রুটি আর এক ঢোক ঝরনার জল খেয়ে নেয়, তারপর আবার হাঁটে।

তিন দিন পূর্ণ হলে গোলাটা একটা বড় বাড়ির সামনে এসে থামল। বারোটা পাথরের উপর বাড়ি, বারোটা থামের উপর। চারিদিকে তার উঁচু বেড়া।

কুকুর ডেকে উঠতেই বাবা-ইয়াগাদের বড়ো বোন অলিন্দে দৌড়ে এল। কুকুরটাকে শান্ত করে সে বলল, 'এস এস, বাছা, তোমার কথা আমি সবই জানি। আমার বোনের

দূত, জাদু দাঁড়কাক আমার কাছে এসেছিল। তোমার দায়-দুঃখে সাহায্য করার উপায় একটা করা যাবে। তার আগে বরং ঘরে ঢুকে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও।'

খাওয়াল, দাওয়াল। তারপর বলল, 'তোমার এখন লুকিয়ে থাকতে হবে—আমার ছেলে জ্‌মেই গরীনীচ-এর আসার সময় হয়ে গেল। বাড়ি ফেরার সময় ক্ষিদে তেষ্টায় ওর মেজাজ একেবারে তিরিক্কি হয়ে থাকে। তোমায় আবার গিলে না খায়।'

বড়ো বোন মাটির নিচের গুদামঘরের দরজা খুলে দিল। বলল, 'নিচে গিয়ে বসে থাক। না ডাকলে এস না।'

তারপর দরজা বন্ধ করতে না করতেই সে কী হুড়মুড় দুমদাম আওয়াজ। দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জ্‌মেই গরীনীচ। সারা ঘর কেঁপে উঠল।

'রুশি মানুষের গন্ধ পাই যে!'

'কী যে বলিস, বাবা, কত বছর হয়ে গেল একটা পাঁশুটে নেকড়েও আসে না, একটা ঝলমলে বাজও ওড়ে না, রুশি মানুষের গন্ধ আসবে কোথা থেকে? পৃথিবীময় ঢুঁড়ে বেড়াস, ও গন্ধ তুই-ই নিয়ে এসেছিস।'

এ কথা বলে বুড়ি টেবিল সাজাতে লেগে গেল। উনুন থেকে বার করল একটা তিন বছর বয়সের ষাঁড়ের রোস্ট, টেবিলে বসাল বড় এক বালতি মদ। জ্‌মেই গরীনীচ এক ঢোকে সবটা মদ শেষ করে আস্ত ষাঁড়ের রোস্টটা মুখে পুরে দিল। খেয়ে-দেয়ে বড় ফুর্তি হল তার।

বলল, 'মা, কার সঙ্গে একটু ফুর্তি করা যায় বল তো, অন্তত গাধা পিটোপিটি তাস খেলবার একটা সঙ্গী থাকলেও হত!'

'গাধা পিটোপিটি তাস খেলে ফুর্তি করে সময় কাটানোর মতো একজন সঙ্গী আমি দিতে পারি, কিন্তু ওর কোনো অনিষ্ট করবি না তো?'

'ভয় নেই মা, আমি তাকে কিছু করব না। কেবল ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছে একটু তাস খেলি, ফুর্তি করি।'

'কিন্তু বাবা, যা বললি মনে রাখিস', এই বলে বাবা-ইয়াগা গুদামঘরের ডালা খুলে বলল, 'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, উঠে এস। বাড়ির কর্তাকে মান্যি করে একটু তাস খেল।'

তাই শুরু হল তাস খেলা। জ্‌মেই গরীনীচ বলল, 'বাজি রইল যে জিতবে সে যে হারবে তাকে খেয়ে ফেলবে।'

সারারাত খেলা চলল। বাবা-ইয়াগার সাহায্য নিয়ে ভোর নাগাদ ক্ষুদে ইভান হারিয়ে দিল জ্‌মেই গরীনীচকে।

তখন জ্‌মেই গরীনীচ মিনতি করে বলল, 'এ বাড়িতেই থেকে যাও সুজন। কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর আবার খেলব, দেখি জিতি কিনা।'

এই বলে সে উড়ে চলে গেল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান সেই ফাঁকে পেট ভরে খেয়ে দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে নিল। বাবা-ইয়াগা তাকে খাওয়াল দাওয়াল।

সূর্য ডোবার পর ফিরে এল জ্‌মেই গরীনীচ। একটা আস্ত ষাঁড়ের রোস্ট আর বড় বালতির দেড় বালতি মদ খেয়ে বলল, 'এস, এবার খেলা শুরু করা যাক। দেখ এবার আমি ঠিক জিতব।'

আবার শুরু হল তাস খেলা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জ্‌মেই গরীনীচ ঘুমে ঢুলে পড়তে লাগল। আগের রাতটা সে মোটে ঘুমোয় নি, সারা দিনমান কেবল পৃথিবীময় ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে। ক্ষুদে ইভান সেই ফাঁকে বাবা-ইয়াগার দৌলতে খেলাটা আবার জিতে নিল। জ্‌মেই গরীনীচ বলল, 'এবার আমায় কাজে বেরতে হবে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা খেলা হবে বাজির তৃতীয় দফা।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বেশ ভালো করে ঘুমিয়ে টুমিয়ে জিরিয়ে নিল। আর ওদিকে জ্‌মেই গরীনীচ ফিরল একেবারে হয়রান হয়ে, দু'রাত্তির ঘুমোয় নি, তার ওপর সারাদিন পৃথিবীময় ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে। একটা আস্ত ষাঁড়ের রোস্ট আর বড় বালতির দু'বালতি মদ খেয়ে সে তার অতিথিকে ডেকে বলল, 'এস কুমার, বসে যাও, এবার ঠিক জিতব।'

সে কিন্তু তখন ভারি ক্লান্ত। থেকে থেকেই ঘুমে ঢুলে পড়ছে। ক্ষুদে ইভান এবারেও জিতে গেল।

জ্‌মেই গরীনীচ তখন ভীষণ ভয় পেয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি করতে থাকে, 'আমায় খেয়ে ফেল না সুজন, মেরে ফেল না! তুমি যা বলবে, তাই করব!'

মায়ের পাও জড়িয়ে ধরে, 'ওকে বল মা, আমায় যেন ছেড়ে দেয়!'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমানের ঠিক এইটেই চাই।

'বেশ, আমি তিনবার জিতেছি জ্‌মেই গরীনীচ। তার বদলে তুমি যদি আমায় আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এই তিনটে জিনিস দাও তবে মিটে যায়।'

জ্‌মেই গরীনীচ তো আহ্লাদে একেবারে আটখানা। তার অতিথি আর বুড়ি মাকে জড়িয়ে ধরে কী তার আদর।

'এ তো আনন্দ করে দেব, ভবিষ্যতে আরো কত ভালো জিনিস জোগাড় করা যাবে।'

তারপর, কী আয়োজন, মহা ভোজন, ক্ষুদে ইভানকে আদর যত্ন করল জ্‌মেই গরীনীচ, তার সঙ্গে ভাই ভাই পাতালে। নিজে থেকেই বলল, 'কেন মিছিমিছি আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল বয়ে বয়ে তুমি হাঁটবে। কোথায় যাবে বল, আমি একদণ্ডেই পৌঁছে দিচ্ছি।'

বাবা-ইয়াগা বলল, 'এই তো কথার মতো কথা, বাছা অতিথিকে নিয়ে তুই সোজা চলে যা আমার ছোট বোন, তোর খালার কাছে। আর সেখান থেকে ফিরবার সময় তোর মেজো খালার সঙ্গেও দেখা করে আসতে ভুলিস না যেন। কতদিন তারা তোকে দেখে নি!'

সাঙ্গ হল ভোজ, ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তার ওই আজব জিনিসগুলো নিয়ে বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিল। জ্‌মেই গরীনীচ তাকে তুলে নিয়ে উড়ে চলল আকাশে। একঘণ্টার মধ্যেই বাবা-ইয়াগাদের সবচেয়ে ছোট বোনের বাড়িতে এসে পৌঁছল তারা। গৃহকর্ত্রী ছুটে এল, আনন্দ করে বরণ করল অতিথিদের।

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান সময় নষ্ট না করে স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে পিঠে চড়ে বসল। তারপর ছোট বোন বাবা-ইয়াগা আর জ্‌মেই গরীনীচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলল নিজের দেশে।

ক্ষুদে ইভান যখন তার আজব জিনিসগুলোকে নিয়ে বহাল-তবিয়তে বাড়ি ফিরল, রাজার কাছে তখন অতিথি এসেছে : তিন জার আর তাদের তিন জারপুত্র, তিন বিদেশি রাজা আর রাজপুত্র, মন্ত্রীসামন্ত পাত্রমিত্র।

ক্ষুদে ইভান ঘরে ঢুকে রাজার হাতে দিল আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল। রাজা তো ভারি খুশি। বলল, 'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, কাজ করে দিয়েছ তুমি। এর জন্যে অনেক বাহবা তোমায়। পুরস্কারও দেব। এতদিন তুমি ছিলে প্রধান সহিস। আজ থেকে তুমি হলে আমার অমাত্য।'

কিন্তু মন্ত্রী আর সামন্তেরা নাক সিঁটকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'একটা সহিস এসে কিনা আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবে! ছি-ছি, কী লজ্জার কথা! রাজামশাই কী পেয়েছেন?'

ওদিকে কিন্তু আপনি-বাজা বাদ্য থেকে বাজনা শুরু হয়ে গেল, রগুড়ে বেড়াল তার সঙ্গে গান জুড়ল আর সেই তালে পা মেলাল নাচিয়ে হাঁস। এমন ফুর্তি লেগে গেল যে বসে থাকা যায় না। মান্যগণ্য অতিথিরাও লেগে গেল নাচতে।

সময় চলে যায় কিন্তু নাচ আর থামে না। জারদের, রাজাদের মুকুট ঢলে পড়ে। জারপুত্র, রাজপুত্রেরা ঘুরে ঘুরে নাচে। মন্ত্রীসামন্তেরা ঘামে আর হাঁপায়, কিন্তু থামতে কেউ পারে না। তখন রাজা হাত নেড়ে বলল, 'হয়েছে ইভান, রগড় থামাও। আমরা সব জেরবার হয়ে পড়েছি।'

ক্ষুদে ইভান তখন তিনটে আজব জিনিস থলিতে ভরে ফেলল, শান্তি হল সকলের।

অতিথিরা যে যেখানে ছিল সেখানেই সবাই ধুপধাপ্ বসে পড়ে খাবি খেতে লাগল।

'সত্যিই মজা বটে, রগড় বটে, এমনটি আর কখনো দেখি নি!'

বিদেশি অতিথিরা সবাই হিংসে করতে লাগল। রাজার আর আনন্দ ধরে না।

'রাজা-মহারাজারা সব এবার আমায় দেখে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে। এমন জিনিস আর কারো নেই!'

মন্ত্রীসামন্তের দল কিন্তু বসে বসে ফুস্‌ফুস্ গুজগুজ করতে লাগল, 'এই যদি চলতে থাকে, তবে তো শিগ্‌গিরই এই গেঁয়ো ভূতটাই হয়ে উঠবে রাজ্যের সেরা মানুষ। রাজার চাকরি-বাকরিগুলোও পাবে ওর গেঁয়ো জাত ভাইগুলো। এখনি যদি ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা না করা যায় তবে আমাদের ভূঁইয়া-সামন্তদের কপালে মরণ আছে।'

তাই পরের দিন মন্ত্রীসামন্তেরা সব কী করে রাজার এই নতুন অমাত্যকে তাড়ান যায় তাই ভাবতে লাগল। বুড়ো একজন রায়বাহাদুর বলল, 'নেশাখোর চৌকিদারটাকে ডেকে আনা যাক, সে এসব ব্যাপারে ওস্তাদ।'

নেশাখোর চৌকিদার এসে কুর্নিশ করে বলল, 'জানি হুজুর, কেন আমায় ডেকেছেন। আমায় যদি আধবালতি মদ খাওয়ান, তবে রাজার নতুন অমাত্যকে কী করে তাড়ান যায় বাতলে দিতে পারি।'

সবাই বলে উঠল, 'বল, আধবালতি মদ তুমি নিশ্চয়ই পাবে।'

গলা ভেজাবার জন্যে চৌকিদারকে এক পেয়ালা মদ দেওয়া হল। চৌকিদার তা খেয়ে বলল, 'আমাদের রাজার চল্লিশ বছর হল বৌ মরে গেছে। তারপর থেকে তিনি সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে বিয়ে করবার জন্যে নানা চেষ্টা করে আসছেন, পারেন নি। তিন-তিনবার তিনি রাজকন্যা আলিওনার রাজ্য আক্রমণ করেছেন। কত সৈন্য মারা গেছে। কিন্তু জয় করতে পারেন নি। সুন্দরী রাজকন্যাকে আনার জন্যে এইবার রাজা ক্ষুদে ইভানকে পাঠান। একবার গেলে আর ফিরতে হবে না।'

একথা শুনে মন্ত্রীসামন্তেরা ভারি খুশি। সকাল হতেই তারা রাজার কাছে গেল।

'মহারাজ, খুব বুদ্ধি করে আপনি এই নতুন অমাত্যটিকে খুঁজে বের করেছেন। ঐ আজব জিনিসগুলো আনা কিছু সহজ কাজ নয়। কিন্তু এখন সে বড়াই করে বলছে সে নাকি সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকেও হরণ করে আপনার কাছে এনে দিতে পারে।'

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনার নাম শুনেই আর রাজা স্থির থাকতে পারল না। সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক বলেছ, এতক্ষণ তো আমার খেয়াল হয় নি! সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে হরণ করতে হলে এই আসল লোক।'

নতুন অমাত্যকে ডেকে বলল, 'তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে তিন দশের রাজ্যে গিয়ে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে নিয়ে এস।'

তা শুনে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলল, 'হুজুর মহারাজ, রাজকন্যা তো আর আপনি-বাজা বাদ্য নয়, নাচিয়ে হাঁসও নয়, রগুড়ে বেড়ালও নয়, থলেতেও তো পোরা যায় না। নিজেই হয়ত আসতেও চাইবে না।'

রাজা কিন্তু রাগে পা ঠুকল, হাত নাড়ল, দাড়ি ঝাড়া দিল। বলল, 'তর্ক কর না! কোনো কথা শুনতে চাই না। যে করে পার তাকে নিয়ে এস। যদি সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে আনতে পার, তবে তোমায় নগর উপনগর দান করব, তোমায় করে দেব আমার রাজ্যের মন্ত্রী। আর যদি না পার, তবে তোমার গর্দান যাবে!'

রাজার কাছ থেকে ক্ষুদে ইভান ফিরে এল গভীর দুঃখে, মাথায় একরাশ ভাবনা। স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে জিন পরাচ্ছে, ঘোড়া জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ, এত মনমরা কেন কর্তা? কোনো বিপদাপদ হয় নি তো?'

'বিপদ বড় নয়, তবে খুশিরও কারণ নেই। সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে নিয়ে আসার জন্যে রাজা আমায় পাঠাচ্ছেন। নিজে তিনি তিন বছর ধরে রাজকন্যার জন্যে

সম্বন্ধ করেছেন, সম্বন্ধ আর হয় নি, তিনবার যুদ্ধে গেছেন, জয় করতে পারেন নি, আর এখন কিনা একলা আমায় পাঠাচ্ছেন নিয়ে আসতে।'

স্বর্ণকেশরী বলল, 'এ আর এমন কী বিপদ, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দুজনে মিলে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।'

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্ষুদে ইভান। ঘোড়ায় উঠতে দেখা গেল, কিন্তু দেখাই গেল না তার ছুটে যাওয়া।

অনেকদিন নাকি অল্পদিন, অনেক দূর নাকি অল্প দূর—ঘোড়া ছুটিয়ে চলল, ইভান এসে পৌঁছল তিন নয়ের রাজ্যে। দেখে—এক মস্ত বেড়া পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বর্ণকেশরী এক লাফে বেড়া পার হয়ে রাজার খাস বাগিচায় গিয়ে পড়ল। বলল, 'আমি এবার একটা আপেল গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তাতে সোনার আপেল ধরবে। তুমি আমার পিছনে লুকিয়ে থাক। সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা কাল বেড়াতে এসে সোনার আপেল তুলতে আসবে, তখন তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেক না কিন্তু, খপ করে ধরে ফেল, আমিও তৈরি থাকব। তারপর আর এক মুহূর্তও নষ্ট কর না—সোজা আমার পিঠে উঠে যেও, আমিও পালাব। কিন্তু মনে রেখ, ভুল করলে তুমি আমি কেউ বাঁচব না।'

পরের দিন সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা খাস বাগিচায় বেড়াতে এল। আপেল গাছটা দেখেই সে তার দাসীবাঁদী সখীসহচরীদের ডেকে বলল, 'কী সুন্দর আপেল গাছ! আপেলও আবার সোনার! তোমরা একটু দাঁড়াও আমি একটা আপেল পেড়ে নিয়ে আসি।'

রাজকন্যা দৌড়ে যেতেই ক্ষুদে ইভান হঠাৎ কোথা থেকে লাফিয়ে এসে সুন্দরী রাজকন্যার হাত চেপে ধরল। আপেল গাছটিও অমনি স্বর্ণকেশরী ঘোড়া হয়ে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকে তাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে ইভান আলিওনাকে নিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। রাজকন্যার দাসীবাঁদী সখীসহচরীরা কিন্তু দেখতে পেল।

চিৎকার করে উঠল তারা, প্রহরীরা সব ছুটে এল, কিন্তু রাজকন্যার চিহ্ন নেই। রাজা সব শুনে প্রত্যেকটি পথে ঘোড়সওয়ারদের পাঠিয়ে দিল খোঁজ করতে। পরের দিন কিন্তু তারা সবাই খালি হাতে ফিরে এল। ঘোড়া ছোটানোই সার হল, চোরকে কেউ চোখেও দেখতে পেল না।

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ততক্ষণে বহু দেশ পেরিয়ে গেছে, নদী-হ্রদ উজিয়ে গেছে।

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা প্রথমটা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল, শেষকালে শান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। একটু করে কাঁদে আর তরুণ কুমারকে চেয়ে দেখে, কাঁদে আর তাকায়। দ্বিতীয় দিন রাজকন্যা ক্ষুদে ইভানের সঙ্গে প্রথম কথা কইল, 'বল, কে তুমি, কোন দেশে বাড়ি, কোন বাহিনীর লোক? কোন কুলের ছেলে? কী বলে ডাকব, মান্যি করব?'

'আমার নাম ইভান, সবাই আমায় ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলে ডাকে। আমি অমুক রাজার অমুক রাজ্য থেকে আসছি, বাবা মা আমার চাষী।'

'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, তুমি কি নিজের জন্যেই আমায় হরণ করেছ, নাকি কারো হুকুমে?'

'আমাদের রাজার আদেশে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।'

তা শুনে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদতে শুরু করল, 'ঐ হাঁদা বুড়োটাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না! তিন বছর ধরে সম্বন্ধ করেছে, সম্বন্ধ হয় নি, তিনবার রাজ্য আক্রমণ করেছে, কত সৈন্য মারা পড়েছে, জয় করে নিতে পারে নি, এবারও আমায় ও কিছুতেই পাবে না।'

তরুণ কুমারের মনে লাগল কথাগুলো, কিন্তু কিছু বলল না। ভাবল, 'আমার যদি এরকম একটি বৌ হতো!'

কিছু কাল পরেই ইভান তার নিজের দেশে এসে পড়ল। বুড়ো রাজা এই কয়দিন জানালা ছেড়ে নড়ে নি, কেবলি পথ চেয়ে দেখেছে কখন আসে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান।

ইভান শহরে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই রাজা একেবারে তার প্রাসাদের সিংহদ্বারে। ইভান রাজপ্রাঙ্গণে ঢুকতে না ঢুকতেই রাজা দৌড়ে এসে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে নামাল তার ধবধবে হাতদুটি ধরে।

বলল, 'কত বছর ধরে ঘটক পাঠিয়েছি, নিজে গিয়ে সম্বন্ধ করেছি, কিন্তু তুমি কেবলি ফিরিয়ে দিয়েছ, কিন্তু এবার তো আমায় বিয়ে করতেই হবে।'

আলিওনা একটু হেসে বলল, 'এতটা পথ এসে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি, মহারাজ, একটু জিরিয়ে নিতে দিন, তারপর বিয়ের কথা বলবেন।

রাজা হন্তদন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে দাসীবাঁদী সখী সহচরীদের ডেকে পাঠাল, 'এই আমার আদরের অতিথির জন্যে ঘর সাজিয়েছ তো?'

'অনেকক্ষণ, মহারাজ।'

'নাও, বরণ কর তোমাদের ভাবী মহারানীকে, যা বলবে সব শুনবে, কিছুর যেন অভাব না হয়!'

দাসীবাঁদী সখী সহচরীর দল তখন রাজকন্যাকে ঘরে নিয়ে গেল। ইভানকে রাজা বলল, 'সাবাশ, ইভান! এই কাজের জন্যে তুমি আমার প্রধানমন্ত্রী হবে, পুরস্কার পাবে তিনটি নগর, তিন উপনগর।'

একদিন যায়, দুদিন যায়, রাজার আর ধৈর্য ধরে না। বিয়েটা না চুকিয়ে তার শান্তি নেই। তাই সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে গিয়ে বলে, 'কবে সবাইকে নিমন্ত্রণ করি, কবে হবে বিয়ে?'

রাজকন্যা বলল, 'কিন্তু কী করে বিয়ে হবে, আমার না আছে বিয়ের আংটি, না আছে রথ?'

রাজা বললে, 'ওঃ, এ তো কোনো কথাই নয়, আমার রাজ্যে কত রথ, কত আংটি। তার একটাও যদি তোমার পছন্দ না হয়, তবে আমি সাগরপারে লোক পাঠাব, সেখান থেকে আনিয়ে দেব।'

'না, মহারাজ, আমার নিজের রথ ছাড়া অন্য রথে আমি বিয়েতে যাব না, আমার নিজের আংটি ছাড়া অন্য আংটি বদল করব না।'

রাজা তখন জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কোথায় তোমার আংটি, কোথায় বিয়ের রথ?'

'আমার আংটি আছে ঝাঁপিতে, ঝাঁপি আছে আমার রথে, আর আমার রথ আছে বুয়ান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলে। যতক্ষণ না তাদের আনতে পারছেন, ততক্ষণ বিয়ের কথা বলবেন না।'

রাজামশাই মুকুট খুলে মাথা চুলকাতে লাগল।

'সমুদ্রের তল থেকে রথ? সে আনা যায় কী করে?'

'সে ভাবনা আমার নয়। যে ভাবে পারেন আনুন', এই বলে রাজকন্যা আলিওনা তার ঘরে চলে গেল।

রাজা একা বসে রইল।

বসে বসে ভাবে আর ভাবে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক্ষুদে ইভানের কথা।

'ও ঠিক এনে দিতে পারবে!'

তক্ষুনি রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী সেবক আমার। তুমি ছাড়া আর কেউ আমায় আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দিতে পারে নি। তুমিই আমায় সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে এনে দিয়েছ। এখন আমার আরেকটা কাজ করে দিতে হবে—আলিওনার বিয়ের আংটি আর রথ এনে দাও। আংটি আছে ঝাঁপিতে, ঝাঁপি আছে রথে, রথ আছে বুয়ান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলে। আংটি রথ যদি এনে দিতে পার, তবে তোমাকে আমার রাজ্যের তিন ভাগের একভাগ দিয়ে দেব।'

তা শুনে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলল, 'কিন্তু মহারাজ, আমি তো আর তিমি মাছ নই, সমুদ্রের তল থেকে কী করে আংটি রথ নিয়ে আসব?'

রাজা রেগে উঠে পা ঠুকে চেঁচাল, 'জানতে চাই না, শুনতে চাই না। রাজার কাজ হুকুম করা, তোমার কাজ তা পালন করা। জিনিসগুলো এনে দাও—পুরস্কার পাবে, না আনলে—গর্দান যাবে!'

ইভান তাই আস্তাবলে ফিরে গিয়ে স্বর্ণকেশরীর পিঠে জিন চড়াতে লাগল। স্বর্ণকেশরী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে কর্তা?'

'আমি নিজেই তা এখনো জানি না, কিন্তু যেতে আমায় হবেই। রাজা হুকুম করেছেন, রাজকন্যার আংটি আর রথ নিয়ে আসতে হবে। আংটি আছে ঝাঁপিতে, ঝাঁপি আছে রথে, আর রথ আছে বুয়ান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলে। তার খোঁজেই চলেছি।'

স্বর্ণকেশরী বলল, 'এ কাজটাই হবে সবার কঠিন। পথ দূরের নয়, তবে, কী জানি কী হয়। রথটা কোথায় আছে তা জানি, কিন্তু পাওয়া সহজ নয়। আমি সমুদ্রের তলে গিয়ে রথ টেনে এনে তুলব। কিন্তু সাগরের ঘোড়াগুলো যদি আমায় দেখতে পায় তবে কামড়ে মেরে ফেলবে। সারা জীবনেও আমাকে দেখতে পাবে না, রথও না।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ভাবনায় পড়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে শেষকালে বের করলে একটা উপায়। রাজাকে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, বারোটা ষাঁড়ের ছাল, বারো পুদ্ আলকাতরামাখা দড়ি, বারো পুদ্ আলকাতরা আর একটি বড় কড়াই চাই আমার।'

রাজা বলল, 'তোমার যা খুশি, যতটা ইচ্ছে নাও। কেবল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড় কাজে।'

তরুণ বীর ইভান তখন গাড়িতে ষাঁড়ের ছাল, দড়ি আর আলকাতরা ভরা বিরাট কড়াই চাপিয়ে তার সঙ্গে স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে যুতে বেরিয়ে পড়ল।

এসে পৌঁছল সমুদ্রের তীরে, রাজার খাস মাঠে। সেখানে নেমে স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে ষাঁড়ের ছালগুলো দিয়ে ঢেকে, ছালগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল।

'সাগরের ঘোড়া তোমায় দেখতে পেলেও সহজে দাঁত বসাতে পারবে না।'

বারোটা ছালই সে জড়িয়ে দিল, বারো পুদ দড়ি দিয়ে তাদের বাঁধল। তারপর আলকাতরা গরম করে ঢেলে দিল—পুরো বারোটি পুদ আলকাতরা মাখালে ছালে দড়িতে।

স্বর্ণকেশরী বলল, 'এখন আর আমার সাগরের ঘোড়াগুলোকে ভয় নেই, তুমি এই মাঠে আমার জন্যে তিন দিন অপেক্ষা করে থাক। বসে বসে তোমার তারের বাজনাটা বাজাও, কখনও চোখ বুজো না কিন্তু।'

এই বলে স্বর্ণকেশরী সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান একা একা বসে রইল সমুদ্রের তীরে। একদিন গেল, দুদিন গেল, ইভানের চোখে ঘুম নেই। সে তার বাজনা বাজায় আর সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। তিন দিনের দিন কিন্তু ঢুলুনি এল ইভানের। ঘুমে সে ঢলে ঢলে পড়ে, বাজনাও আর তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে না। যতক্ষণ পারল ঘুমের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝল, কিন্তু শেষকালে আর না পেরে ঘুমিয়েই পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, ঘুমের মধ্যে শোনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ইভান চোখ মেলে দেখে কী, তারই স্বর্ণকেশরী ঘোড়া রথ টেনে আনছে তীরে। আর ছ'টা স্বর্ণকেশরী সাগরের ঘোড়া ঝুলছে তার দুপাশে।

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তার ঘোড়ার কাছে দৌড়ে যেতেই ঘোড়া বলল, 'তুমি যদি আমায় ষাঁড়ের ছাল আর দড়ি বেঁধে আলকাতরা ঢেলে না দিতে, তবে আর আমায় দেখতে পেতে না, সাগরের ঘোড়ারা দল বেঁধে আমায় তেড়ে এসেছিল। ন'টা ছাল একেবারে কুটি করে ফেলেছে, আরো দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে। এই ছ'টা ঘোড়ার দড়ি আর আলকাতরায় এমন জোর দাঁত আটকে গেছে যে ছাড়াতে পারে নি। ভালোই হয়েছে, এরা তোমার কাজে লাগবে।'

তরুণ বীর ইভান তখন সাগরের ঘোড়াগুলোকে দড়িতে বেঁধে চাবুক বের করে তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করল। ঘোড়াদের চাবুক মারে আর বলে, 'মনিব বলে মানবি

কিনা বল? আমার হুকুমে চলবি কিনা বল? নইলে তোদের পিটিয়ে মারব, নেকড়ের মুখে ছুড়ে দেব!'

'কষ্ট দিও না বীর, মের না, যা বলবে সব আমরা শুনব। ধম্মমতে কাজ করব। বিপদে আপদে রক্ষা করব।'

তখন ইভান মার বন্ধ করে সাতটা ঘোড়াকেই গাড়ির সঙ্গে যুতে বাড়ি ফিরল। গাড়ি ছুটিয়ে এল একেবারে সিংহদরজার সামনে। স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটা সমেত ছ'টা সাগরের ঘোড়াকে আস্তাবলে রেখে দিয়ে ক্ষুদে ইভান গেল রাজার কাছে।

'মহারাজ, আপনার রথ নিন। গাড়ি-বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে তার যৌতুক।'

রাজার তখন আর ধন্যবাদ দেবারও তর সয় না। এক ছুটে রথ থেকে ঝাঁপিটি নিয়ে একেবারে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনার কাছে।

'আলিওনা, শখ তোমার মিটিয়েছি, সব ইচ্ছে পুরিয়েছি। তোমার ঝাঁপি, তোমার আংটি এনেছি। দেখ, বিয়ের রথ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার বল, কবে আমাদের বিয়ে হবে, কোন তারিখে নেমন্তন্ন করব?

সুন্দরী রাজকন্যা উত্তর দিল, 'বিয়ে করতে রাজি আছি, ভোজও শিগ্‌গিরই হতে পারে। তবে অমন শাদাচুলো বুড়ো আসবে বর হয়ে, সেটা আমার মন চাইছে না। লোকে নিন্দে করবে, দোষ ধরবে, দেখে হাসবে, বলবে, 'একটা বুড়ো হাবড়ার কচি বৌ।' বুড়োর বউ পরের ধন। লোকের মুখের কথা, চাপা দেবে কে তা! তাই বলি, বিয়ের আগেই আপনি যদি আবার জোয়ান হয়ে যেতে পারেন, তাহলে সব দিক থেকেই ভালো।'

রাজা বলল, 'জোয়ান হতে পারলে তো ভালোই। তুমিই নয় শিখিয়ে দাও কেমন করে হব। বুড়ো আবার ফিরে জোয়ান হয় এমন কথা তো রাজ্যের কেউ কখনো শোনে নি।'

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা বলল, 'তিনটে বড় বড় তামার কড়াই চাই। একটাতে থাকবে এক কড়াই ভর্তি দুধ, অন্য দুটোতে ঝরনার জল। একটা জলের কড়াই আর দুধের কড়াইটা আগুনে চড়াবেন। যেই ফুটতে আরম্ভ করবে অমনি আপনি প্রথমে লাফিয়ে পড়বেন দুধের কড়াইতে, তারপর গরম জলেরটাতে আর শেষকালে ঠাণ্ডা জলে। ডুব দিয়ে বেরিয়ে এলেই দেখবেন আপনি আবার কুড়ি বছরের সুন্দর জোয়ান হয়ে গেছেন।'

রাজা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পুড়ে যাব না তো?'

'আমাদের রাজ্যে একটিও বুড়ো নেই। সবাই এইভাবে পুনর্যৌবন পায় কিন্তু কেউ তো কোনোদিন পুড়ে যায় নি।'

রাজামশাই ফিরে গিয়ে আলিওনার কথামত সব জোগাড়যন্ত্র করল।

দুধ আর জল যখন টগবগ করে উঠল, রাজা তখন আর মন স্থির করতে পারে না। ভীষণ তার ভয়। কড়াই তিনটের চারদিকে কেবলি পায়চারি করে বেড়ায়। হঠাৎ তার

মাথায় খেলল, 'আরে, আমি এত ভাবছি কেন? আগে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ঝাঁপ দিয়ে চান করে আসুক, দেখি কী হয়। যদি ওর কিছু না হয় তাহলে পরে আমিও ডুব দেব। আর যদি পুড়েই যায় তাহলে কাঁদবার কিছু নেই। ওর ঘোড়া কটা আমার হয়ে যাবে, রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগও দিতে হবে না।'

এই ভেবে রাজা ক্ষুদে ইভানকে ডেকে পাঠাল, 'হুজুর মহারাজ আবার আপনার কী প্রয়োজন? আমি যে এখনো একটু জিরিয়ে নিতেও পারি নি।'

'বেশিক্ষণ আটকাব না। তুমি কেবল একবার এই কড়াইগুলোতে ঝাঁপ দাও, ব্যস তারপর তোমার ছুটি।'

ক্ষুদে ইভান কড়াইগুলোর দিকে তাকাল। দুটো কড়াইতে জল আর দুধ ফুটছে। কেবল তৃতীয় কড়াইয়ের জলটা ঠাণ্ডা।

ইভান বলল, 'বলেন কী মহারাজ, আপনি আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চান নাকি? এই বুঝি বিশ্বাসী কর্মচারীর পুরস্কার!'

'আরে, না না ইভান, কোনো বুড়ো যদি ঐ কড়াইগুলোতে একবার করে ডুব দিতে পারে, ব্যস অমনি সে জোয়ান সুপুরুষ হয়ে যাবে।'

'হুজুর মহারাজ, আমি তো এমনিতেই বুড়ো নই, জোয়ান হবার কী আছে আমার?'

ভীষণ রেগে গেল রাজা, 'আচ্ছা বেয়াদব তো হে তুমি! আমার কথার ওপরে কথা। নিজের ইচ্ছেয় যদি ডুব না দাও তবে জোর করে দেওয়াব, যম দুয়ারে পাঠাব।'

ঠিক সেই সময় সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা ছুটে এল ঘর থেকে। সুযোগ বুঝে রাজার অলক্ষ্যে ফিসফিস্ করে ক্ষুদে ইভানকে বলল, 'ঝাঁপ দেবার আগে তোমার সাগরের ঘোড়া আর স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে জানিয়ে দাও। তাহলে আর ভয় থাকবে না।'

রাজাকে বলল, 'দেখতে এলাম যা বলেছি সব ঠিকঠাক আয়োজন করা হয়েছে কিনা।'

এই বলে রাজকন্যা এগিয়ে গিয়ে কড়াইগুলোর মধ্যে উঁকি মেরে দেখল।

বলল, 'ঠিক আছে। এবার মহারাজ চান করে নিন। আমি বিয়ের জন্যে তৈরি হই গে।'

এই বলে রাজকন্যা ঘরে চলে গেল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান রাজার দিকে একবার চেয়ে চলল, 'বেশ, রাজামশাই শেষবারের মতো আপনার শখ মেটাব। কী আর আছে করবার, মরবে মানুষ একবার। কেবল আমার স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটাকে দেখে আসি। আমরা দু'জন একসঙ্গে কত ঘুরে বেড়িয়েছি। কে জানে হয়ত এই শেষ দেখা।'

'যাও, কিন্তু বেশি দেরি কর না।'

ক্ষুদে ইভান তখন আস্তাবলে গিয়ে তার স্বর্ণকেশরী ঘোড়া আর ছ'টা সাগর ঘোড়ার কাছে সব কথা খুলে বলল। ঘোড়ারা বলল, 'আমরা যেই একসঙ্গে তিনবার ডাকব অমনি তুমি নির্ভয়ে ঝাঁপ দিও।'

ইভান রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'মহারাজ! আমি প্রস্তুত, এই মুহূর্তে ঝাঁপ দেব।'

ইভান শুনতে পেল ঘোড়াগুলো ডাকছে—একবার, দুই বার, তিন বার—তিন ডাক শোনামাত্র ঝপাং—ইভান একেবারে গরম দুধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর বেরিয়ে এসে গরম জলে লাফিয়ে পড়ল। আর সবশেষে ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে ইভান যখন বেরিয়ে এল তখন সে কী তার রূপ! সে রূপ বলার নয়, লেখার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়।

রাজা ক্ষুদে ইভানকে দেখে আর ইতস্তত করল না। কোনোক্রমে বেদীর উপর উঠে গরম দুধে ঝাঁপ দিল, সিদ্ধ হতে থাকল সেখানেই।

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা তখন পড়িমরি ছুটে এল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমানের ধবধবে হাতটা তুলে নিয়ে আঙুলে পরিয়ে দিল আংটিটা। মিষ্টি হেসে বলল, 'তুমি আমায় রাজার হুকুমে হরণ করেছ। এখন তো আর রাজা নেই; এখন তোমার যা খুশি। ইচ্ছা হয় আমায় আবার ফিরিয়ে দিও, ইচ্ছে হয় কাছে রেখ।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান সুন্দরী রাজকন্যার হাতটি ধরে বৌ বলে ডাকল, আঙুলে তার নিজের আংটিটি পরিয়ে দিল।

তারপর দূত পাঠিয়ে বাবা, মা, তার বত্রিশ ভাইকে বিয়ের নেমন্তন্নে ডেকে আনল গ্রাম থেকে।

কিছু পরেই রাজবাড়িতে এসে হাজির হল বত্রিশটি তরুণ বীর, আর তার বাবা আর মা।

বিয়ে হল, ভোজ হল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান আর তার সুন্দরী বৌ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। মা-বাবার দেখাশোনা করে।

মাছের আজ্ঞায়

এক যে ছিল বুড়ো। বুড়োর তিন ছেলে। দুজন ছিল খুব চালাক চতুর কিন্তু তৃতীয় জন হাঁদা ইয়েমেল্যা।

বড় দু'ভাই সারাক্ষণ কাজ করে আর ইয়েমেল্যা খালি চুল্লির তাকে শুয়ে থাকে, কোনো কিছু শেখার আগ্রহ নেই।

একদিন বড় ভাইয়েরা হাটে গেছে, তাদের দু'বৌ ইয়েমেল্যাকে বলল, 'ইয়েমেল্যা, যাও তো, জল নিয়ে এস।'

ইয়েমেল্যা চুল্লির তাকে শুয়ে শুয়েই বলে, 'ইচ্ছে করছে না...'

'যাও ইয়েমেল্যা, নইলে কিন্তু দাদারা তোমার জন্যে হাট থেকে কিছু আনবে না, দেখ!'

'বেশ, তবে যাচ্ছি।'

তড়াক করে চুল্লি থেকে নেমে ইয়েমেল্যা জামা-জুতো পরে বালতি কুড়ুল নিয়ে নদীর দিকে চলল।

নদীতে গিয়ে ইয়েমেল্যা কুড়ুল দিয়ে বরফের গায়ে একটা গর্ত খুঁড়ে দু'বালতি জল তুলল। তারপর বালতি দুটো নামিয়ে রেখে উঁকি দিয়ে দেখল বরফের গর্তের ভিতরে। দেখে কি, একটা মাছ। ধাঁ করে ইয়েমেল্যা মুঠোর মধ্যে মাছটাকে ধরে ফেলল।

'বাঃ তোফা মাছের ঝোল হবে আজ!'

মাছটা হঠাৎ মানুষের গলায় বলে উঠল, 'ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা উপকার করব।'

ইয়েমেল্যা কিন্তু হেসে উঠল, 'তুমি আবার কী উপকার করবে? না হে বাপু, আমি তোমায় বাড়িতেই নিয়ে যাব, বৌদিদের বলব ঝোল বানিয়ে দিতে। চমৎকার ঝোল হবে।'

কিন্তু মাছটা আবার মিনতি করে বলতে লাগল, 'আমায় ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা, তুমি যা চাও আমি তাই করব।'

ইয়েমেল্যা বলল, 'ঠিক আছে, তবে আগে দেখাও যে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ না, তবে ছেড়ে দেব।'

'তুমি কী চাও বল।'

'আমি চাই আমার বালতি দুটো নিজেরাই হেঁটে হেঁটে বাড়ি চলে যাক, কিন্তু একফোঁটা জলও যেন ছলকে না পড়ে...'

মাছ বলল, 'আমার কথা মনে রেখ, তোমার কিছু দরকার হলে কেবল বল,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়!'

ইয়েমেল্যা বলে উঠল,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—

বালতি, তোরা নিজেরা হেঁটে হেঁটে বাড়ি চলে যা তো!'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি বালতি পাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল।

ইয়েমেল্যা মাছটাকে সেই বরফের গর্তে ছেড়ে দিয়ে বালতি দুটোর পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

বালতি দুটো গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। গ্রামবাসীরা সব অবাক। ইয়েমেল্যা কিন্তু হাসে আর বালতির পিছন পিছন আসে...বালতি দুটো সোজা ইয়েমেল্যার বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে মাচার উপর উঠে বসল। ইয়েমেল্যাও তার চুল্লির তাকে উঠে গা গড়ালে।

গেল অনেক দিন, নাকি অল্প দিন। বৌদিরা এসে আবার ইয়েমেল্যাকে বলে, 'ইয়েমেল্যা, শুয়ে আছো যে? বরং কিছু কাঠ চ্যালা কর।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

'না গেলে কিন্তু হাট থেকে দাদারা তোমার জন্যে কিছু আনবে না।'

ইয়েমেল্যার মোটেই চুল্লির তাক ছেড়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না। মাছের কথা মনে পড়ল তার, ফিস্‌ফিস্ করে বলল,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—

যা কুড়ুল গিয়ে কাঠ চ্যালা কর্ আর চ্যালা কাঠ তোরা বাড়িতে ঢুকে চুল্লির মধ্যে লাফিয়ে পড়।'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি কুড়ুলটা বেঞ্চির তল থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে কাঠ কাটতে লাগল, আর চ্যালা কাঠগুলোও সার বেঁধে নিজেরাই ঘরের মধ্যে ঢুকে

চুল্লিতে লাফিয়ে পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ। বৌদিরা আবার এসে ইয়েমেল্যাকে বলল, 'একটুও কাঠ নেই, ইয়েমেল্যা, যাও বনে গিয়ে কিছু কাঠ কেটে আন।'

ইয়েমেল্যা চুল্লির ওপর থেকে বলে, 'তোমরা রয়েছ কী করতে?'

'কী বলছ তুমি, ইয়েমেল্যা? বনে গিয়ে কাঠ কাটা কি আমাদের কাজ?'

'আমার ইচ্ছে করছে না...।'

'তবে কোনো জিনিসও পাবে না।'

কী আর করে, ইয়েমেল্যা চুল্লির তাক থেকে নেমে এসে জুতো জামা পরে দড়ি আর কুড়ুল নিয়ে উঠোনে গেল। স্লেজে চড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফটক খুলে দাও।'

বৌদিরা বলল, 'করছ কী হাঁদারাম স্লেজে বসেছ ঘোড়া জোত নি?'

'ঘোড়া টোড়ার দরকার নেই আমার।' বৌদিরা ফটক খুলে দিল আর ইয়েমেল্যা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল,

'মাছের আজ্ঞায়
মোর ইচ্ছায়—

যা স্লেজ, চলে যা বনে...'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি স্লেজটা এমন জোরে ফটক পার হয়ে দৌড়তে লাগল। যে ঘোড়া ছুটিয়েও তার নাগাল পাওয়া ভার।

বনের পথটা গেছে এক শহরের মধ্য দিয়ে, স্লেজটা যে কত লোককে উল্টে ফেলে দিল, কত লোককে চাপা দিল, তার আর ইয়ত্তা নেই। শহরের লোক সব 'ধর, ধর, পাকড়, পাকড়!' করে চেঁচিয়ে উঠল। ইয়েমেল্যা কিন্তু তোয়াক্কাই করল না, কেবল স্লেজটাকে আরো জোরে ছোটাল। বনে এসে বলে,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—

যা কুড়ুল, কিছু শুকনো দেখে ডাল কেটে নিয়ে আয় আর কাঠরা, তোরা স্লেজে উঠে আপনা থেকেই বাঁধা হয়ে যা...'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি কুড়ুল খট্‌খট্‌ খট্‌খট্‌...শুকনো কাঠ কাটতে লেগে গেল, আর কাঠগুলোও একটার পর একটা স্লেজে উঠে দড়ি বাঁধা হয়ে যেতে লাগল। ইয়েমেল্যা তখন কুড়ুলকে একটা ভারী মুগুর কেটে দিতে হুকুম করল। এমন ভারী যেন তুলতে কষ্ট হয়। তারপর সেই কাঠের উপর বসে বলল,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—

চল্‌ স্লেজ, বাড়ি চল্‌!'

স্লেজটাও ছুটল বাড়িমুখো। যে শহরটার অনেক লোককে সে আসার সময় চাপা দিয়েছিল, তারা তো লাঠিসোঁটা নিয়ে তৈরি—কখন সে ফেরে। ইয়েমেল্যাকে তারা ধরে স্লেজ থেকে টেনে নামিয়ে গাল দেয়, পিটোয়।

ব্যাপার সঙ্গীন দেখে ইয়েমেল্যা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠল,

'মাছের আজ্ঞায়,

মোর ইচ্ছায়—

আয় মুগুর, দে ব্যাটাদের হাড় গুঁড়িয়ে...'

মুগুরও অমনি লাফিয়ে উঠে দে পিটুনি। শহরের লোক দে ছুট। ইয়েমেল্যা তখন বাড়ি ফিরে আবার চুল্লির তাকে উঠে শুয়ে পড়ল।

অনেকদিন নাকি অল্প দিন—ইয়েমেল্যা কীর্তির কথা রাজার কানে গেল। রাজপ্রাসাদে তাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাল রাজা।

রাজার লোক এল ইয়েমেল্যার গ্রামে। তার কুঁড়েঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই কি হাঁদা ইয়েমেল্যা?'

চুল্লির তাকের উপর থেকেই ইয়েমেল্যা বলে, 'তোমার তাতে কী?'

'তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নাও, তোমায় রাজার বাড়ি নিয়ে যাব।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

রাজার লোকটা রেগে গিয়ে ইয়েমেল্যার গালে মারল এক চড়। ইয়েমেল্যা তখন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল,

'মাছের আজ্ঞায়,

মোর ইচ্ছায়—

দে তো মুগুর হাড় গুঁড়িয়ে...'

সঙ্গে সঙ্গেই মুগুর লাফিয়ে উঠে এমন মার মারল যে লোকটা কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচল।

রাজার পেয়াদা ইয়েমেল্যাকে কাবু করতে পারে নি শুনে রাজা গেল অবাক হয়ে। মহাসামন্তকে ডেকে বলল, 'হাঁদা ইয়েমেল্যাকে খুঁজে-পেতে আমার কাছে ধরে আনা চাই, নইলে তোমার গর্দান যাবে।'

রাজার মহাসামন্ত কিশমিশ, খেজুর আর মিষ্টি-রুটি কিনে নিয়ে সেই সে গ্রামের সেই সে বাড়িতে এসে বৌদিদের কাছে জিজ্ঞেস করল ইয়েমেল্যা সবচেয়ে কী ভালোবাসে।

ওরা বলল 'ইয়েমেল্যা চায় মিষ্টি কথা। ওর সঙ্গে যদি ভালো ব্যবহার করেন, লাল কাফতান উপহার দেন, তবে যা বলবেন ও তাই করে দেবে।'

মহাসামন্ত তখন ইয়েমেল্যাকে সেই সব কিশমিশ, খেজুর মিষ্টি-রুটি দিয়ে বলল, 'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, কেন শুধু শুধু চুল্লির তাকে শুয়ে আছ? চল না আমার সঙ্গে রাজার বাড়ি যাই।'

ইয়েমেল্যা বলল, 'এখানেই বেশ আছি...'

'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় কত ভালোমন্দ খাওয়াবেন। চল যাই।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় দেবেন একটা লাল কাফতান, টুপি, জুতো।'

'ঠিক আছে, আপনি আগে আগে চলে যান, আমি পরে আসছি।'

মহাসামন্ত ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল, ইয়েমেল্যা চুল্লির তাকে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বলল,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—
চল চুল্লি, আমায় রাজার বাড়ি নিয়ে চল!'

যেই না বলা, অমনি ঘরের কোণ ফেটে গেল, বাড়ির চাল নড়ে উঠল, একদিকের দেয়াল ধসে পড়ল আর চুল্লিটা নিজে নিজেই বেরিয়ে পড়ে সোজা পথ ধরে রওনা দিল রাজবাড়ির দিকে।

রাজামশাই তো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক।

'ওটা কী ব্যাপার?'

মহাসামন্ত বলল, 'আজ্ঞে, ঐ তো ইয়েমেল্যা, তার চুল্লিতে চড়ে আপনার প্রাসাদে আসছে।'

রাজামশাই অলিন্দে এসে বলল, 'শোন ইয়েমেল্যা, তোমার নামে অনেক নালিশ এসেছে। অনেক লোককে স্লেজ চাপা দিয়েছ তুমি।'

'ওরা আমার স্লেজের নিচে পড়ল কেন?'

রাজার মেয়ে রাজকন্যা মারিয়া সেই সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। ইয়েমেল্যা দেখেই ফিস্‌ফিস্ করে বলল,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—
রাজার মেয়ে আমায় ভালোবাসুক...'

তারপর বলল, 'চল চুল্লি, বাড়ি চল!'

চুল্লিটা ঘুরে সোজা ইয়েমেল্যার গ্রামে পৌঁছে গেল। তারপর বাড়ি ঢুকে ঠিক নিজের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইয়েমেল্যাও শুয়ে রইল আগের মতো।

ওদিকে রাজবাড়িতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। রাজকন্যা মারিয়া ইয়েমেল্যার জন্যে অস্থির, ওকে ছাড়া বাঁচবে না। রাজাকে সে কত করে বলতে লাগল ইয়েমেল্যার সঙ্গে বিয়ে দিক। বিপদে পড়ে গেল রাজা। মনের দুঃখে শেষে তার মহাসামন্তকে ডেকে বলল, 'যাও, ইয়েমেল্যাকে নিয়ে এস। জ্যান্ত-মরা যেভাবে পাও, নইলে তোমার গর্দান যাবে।'

মহাসামন্ত তো আবার নানারকম সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার, মিষ্টি মদ নিয়ে রওনা হল। সেই সে গ্রামে সেই সে বাড়িতে গিয়ে রাজভোজ খাওয়াতে লাগল ইয়েমেল্যাকে।

ইয়েমেল্যা পান করল, ভোজন করল, বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মহাসামন্ত তখন ঘুমন্ত ইয়েমেল্যাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল রাজার কাছে।

রাজামশাই তখুনি একটা মস্ত—লোহা লাগানো পিপে নিয়ে আসার হুকুম দিল। ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা মারিয়াকে ভিতরে পুরে পিপেটা আলকাতরা মাখিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রে।

বহুক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ কে জানে। ঘুম ভেঙে ইয়েমেল্যা দেখে–চারিদিকে চাপাচাপি, অন্ধকার।

'কোথায় আমি?'

উত্তর এল, 'আমাদের কপাল খারাপ, আমার আদরের ইয়েমেল্যা! ওরা আমাদের একটা আলকাতরা মাখানো পিপেতে পুরে নীল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে।'

ইয়েমেল্যা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি রাজকন্যা মারিয়া।'

ইয়েমেল্যা বলল,

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—
আয় তো রে ঝড়ের হাওয়া পিপেটাকে নিয়ে যা শুকনো তীরে, হলুদ বালিতে...'

যেই না বলা, অমনি জোর হাওয়া উঠল, সমুদ্রের বুক দুলে উঠল, আর পিপেটা গিয়ে ঠেকল শুকনো তীরে, হলুদ বালিতে। ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা মারিয়া এল বাইরে। রাজকন্যা বলল,

'থাকব কোথায়, ইয়েমেল্যা? তুমি যেমন হোক একটা ঘর তোল।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

রাজকন্যা তখন অনেক সাধ্যসাধনা করল। ইয়েমেল্যা বলল :

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—
এক্ষুনি এখানে সোনার ছাদওয়ালা একটা পাথরের প্রাসাদ হয়ে যাক...'

বলতে না বলতেই সোনার ছাদওয়ালা একটা চমৎকার পাথরের প্রাসাদ হয়ে গেল তাদের চোখের সামনে। চারদিকে তার সবুজ বাগান : ফুল ফুটছে, পাখি গাইছে। রাজকন্যা মারিয়া আর ইয়েমেল্যা প্রাসাদের ভিতর ঢুকে জানালার পাশে বসল।

রাজকন্যা বলল, 'আচ্ছা ইয়েমেল্যা, খুব সুন্দর হয়ে যেতে পার না তুমি?'

ইয়েমেল্যার ভাবার কিছু ছিল না। বলে উঠল।

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়—
হয়ে যাই যেন বীর তরুণ, রূপে অরুণ...'

অমনি এমন সুন্দর হয়ে উঠল ইয়েমেল্যা যে সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়।

এদিকে হয়েছে কী, ঠিক সেই সময় রাজামশাই শিকার করতে এসে দেখে, আগে যেখানে কিচ্ছু ছিল না সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ।

'কার এত বড় আস্পর্ধা, আমার অনুমতি না নিয়ে আমার জমিতে বাড়ি বানায়!'

সঙ্গে সঙ্গে দূত ছুটল খোঁজখবর করতে : কে লোকটা।

দূতেরা ছুটে গিয়ে জানালার নিচ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

ইয়েমেল্যা বলে, 'রাজামশাই আমার ঘরের অতিথি, আসুন, আমি নিজে তাঁকে বলব।'

রাজামশাই এল। ইয়েমেল্যা তাকে বরণ করে নিয়ে এল পুরীতে, টেবিলে বসাল। শুরু হল ভোজ। রাজামশাই চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খায় আর অবাক হয়ে যায়। শেষকালে আর থাকতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি তরুণ বীর?'

ইয়েমেল্যা বলল, 'হাঁদা ইয়েমেল্যাকে আপনার মনে আছে? সেই যে চুল্লির মাথায় চড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে আর রাজকন্যা মারিয়াকে আলকাতরা মাখা পিপেতে পুরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, আমিই সেই ইয়েমেল্যা। ইচ্ছে করলে আপনার সমস্ত রাজত্বটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে পারি আমি।'

রাজামশাই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে ইয়েমেল্যার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। বলল, 'আমার মেয়েকে বিয়ে কর ইয়েমেল্যা, আমার রাজত্ব ভোগ কর, কিন্তু প্রাণে মের না!'

অমনি, কী আয়োজন, পান-ভোজন। রাজকন্যা মারিয়াকে বিয়ে করে সুখস্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগল ইয়েমেল্যা। কাহিনী হল সারা, শুনল লক্ষ্মী যারা।

চাষির ছেলে ইভান আর আজব দানব

সে এক রাজ্যে, সে এক দেশে ছিল দুই বুড়োবুড়ি, তাদের তিন ছেলে। ছোট ছেলেটির নাম ইভান। দিন কাটাত খেটেখুটে? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেবল একাজ, সেকাজ : লাঙল দিত, বীজ বুনত।

হঠাৎ সেই সে রাজ্যে সেই সে দেশে শোনা গেল এক দুঃসংবাদ : আজব দানব ঠিক করেছে হামলা করবে তাদের দেশে, লোকজনকে মারবে, গ্রাম-নগর ছারখার করবে। বুড়োবুড়ি হায় হায় করতে লাগল। তখন বড় দুই ছেলে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'দুঃখ করো না মা-বাবা। আমরা চললাম আজব দানবের কাছে, লড়াই করে মারব ওকে। ইভান রইল তোমাদের কাছে, একা একা লাগবে না। ও এখনো ছোট, লড়াইয়ে যাবার বয়স হয় নি।'

ইভান বলল, 'না, তোমাদের পথ চেয়ে ঘরে বসে থাকতে চাই না। আজব দানবের সঙ্গে আমিও যাব লড়তে।'

বুড়োবুড়ি সাধ্য-সাধনা করে ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করল না।

যাত্রার জন্যে তিন ছেলেকেই সাজিয়ে দিল তারা। তিন ভাই নিল তাদের কাঠের ভারী ভারী লাঠি, থলে ভরে নিল নুন আর রুটি, তারপর ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল।

অল্প পথ নাকি দূর পথ, কত দূর পাড়ি দিল কে জানে। দেখা হল এক বুড়োর সঙ্গে।

'কুশল হোক বাছা, ভালো মানুষেরা!'

'কুশল হোক, দাদু!'

'তা তোরা চললি কোথায়?'

'চলেছি রাক্ষস আজব দানবের সঙ্গে লড়তে, জুঝতে, দেশের মাটি রুখতে!'

'সাবাশ! সাবাশ! তবে লড়তে গেলে লাঠি নয়, চাই দামাস্কাস ইস্পাতের তরোয়াল।'

'তা পাই কোথায়, দাদু?'

'তবে বলি শোন : একেবারে নাকবরাবর চলে যাও বাছা, ভালো মানুষেরা। চলে যাবে এক উঁচু পাহাড় পর্যন্ত। সেই পাহাড়ে আছে এক গভীর গুহা। মস্ত এক পাথর দিয়ে তার মুখ আটকানো। পাথর ঠেলে গুহায় ঢুকলেই দেখবে দামাস্কাস ইস্পাতের তরোয়াল।'

বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে তিন ভাই ওর কথামতো চলল সোজা পথ ধরে। দেখল দাঁড়িয়ে আছে এক মস্ত পাহাড়, তার একপাশে মস্ত এক ছাইরঙা পাথর দিয়ে মুখ আটকানো। তিন ভাই পাথর ঠেলে সরিয়ে ঢুকল গুহার মধ্যে। নানারকম অস্ত্রের সেখানে ছড়াছড়ি, গুনে শেষ করা যায় না। এক এক ভাই এক একটি তরোয়াল বেছে নিয়ে চলল এগিয়ে।

বলল, 'পথের বুড়োটাকে ধন্যবাদ। তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করা অনেক সহজ!'

চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছল এক গ্রামে। চারিদিকে চেয়ে দেখল একটিও জনপ্রাণী নেই। সবই জ্বালানো পোড়ানো, ছারখার। টিকে আছে কেবল একটি ছোট্ট কুটির। কুটিরের মধ্যে ঢুকল তিন ভাই। দেখে চুল্লির ওপর শুয়ে আছে এক বুড়ি, কোঁকাচ্ছে।

'সালাম, দাদিমা!' বলল তিন ভাই।

'সালাম, বাছারা! চলেছ কোথায়?'

'চলেছি স্মরোদিনা নদীর কালিনা সাঁকোয়। আজব দানবের সঙ্গে লড়ব। দেশের মাটি রুখব।'

'সাবাশ, সাবাশ সংকল্প করেছিস বাছারা! সবকিছু ছারখার করছে পিশাচটা! আমাদের গাঁয়েও এসেছিল, বেঁচে আছি কেবল আমি একলা...'

বুড়ির ঘরে রাত কাটাল তিন ভাই, তারপর সকাল সকাল উঠে রওনা দিল।

এল সেই স্মরোদিনা নদীর কালিনা সাঁকোয়। সারা তীরজুড়ে ছড়িয়ে আছে ভাঙা ধনুক, ভাঙা তরোয়াল, পড়ে আছে মানুষের হাড়...

একটা ফাঁকা ঘর খুঁজে তিন ভাই ঠিক করল সেখানেই থাকবে।

ইভান বলল, 'কিন্তু ভাই, আমরা এসে পড়েছি বিদেশবিভুঁইয়ে। তাই চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। এসো আমরা পালা করে পাহারা দিই, কালিনা সাঁকো দিয়ে আজব দানব যেন না এসে পড়ে।'

প্রথম রাত্রিতে পাহারায় রইল বড় ভাই। তীরে গিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল স্মরোদিনা নদীতে সব চুপচাপ; কাউকে দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না। একটা ঝোপের ধারে শুয়ে পড়ল বড় ভাই, অঘোরে ঘুমাল, সজোরে নাক ডাকাল।

এদিকে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে ইভান, ঘুম তার আসে না, চোখের পাতা বোজে না। রাত দু'প্রহর পার হতেই সে দামাস্কাস ইস্পাতের তরোয়াল নিয়ে চলল স্মরোদিনা নদীতে।

দেখে কী, ঝোপের ধারে ঘুমাচ্ছে বড় ভাই, দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। ইভান কিন্তু ভাইকে জাগাল না, কালিনা সাঁকোর নিচে গিয়ে লুকিয়ে রইল, চোখ রাখল পথটার উপর।

হঠাৎ ফুঁসে উঠল নদীর জল, ওক গাছে চেঁচিয়ে উঠল ঈগল—এগিয়ে এল ছয়মুণ্ডু আজব দানব। কালিনা সাঁকোর মাঝামাঝি এসেছে, এমন সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ঘোড়া, কাঁধের উপরের দাঁড়কাকটা ডানা ঝাপটাতে লাগল, আর পিছন পিছন আসা কালো কুকুরটা শিউরে উঠল।

ছয়মুণ্ডু আজব দানব বলল,

'সে কী, কেন হুমড়ি খেয়ে পড়লি, আমার ঘোড়া? কেন ঝটপটিয়ে উঠলি তুই, কালো দাঁড়কাক? কেন শিউরে উঠলি তুই, কালো কুকুর? নাকি তোরা টের পেয়েছিস যে চাষির ছেলে ইভান এসে হাজির হয়েছে এখানে? কিন্তু তার তো জন্মই হয় নি এখনো, জন্মে থাকলেও লড়বার যোগ্য হয় নি। এক হাতে তুলে ধরে অন্য হাতের চাপড়েই শেষ করে দেব!'

চাষির ছেলে ইভান তখন সাঁকোর তল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বড়াই রাখ তুই পাষণ্ড, আজব দানব! ঝলমলে বাজপাখিটাকে না মেরেই তার পালক ছাড়াতে চাস। ভালো মানুষের ছেলেকে না চিনেই গালমন্দ করতে আসিস, না! বরং আয়, শক্তি পরীক্ষা হোক : যে জিতবে, বড়াই করবে সে।'

তাই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি হল, এমন জোরে আঘাত পড়ল যে, চারিদিকের মাটি কেঁপে উঠল।

কিন্তু আজব দানবের কপাল মন্দ, এক আঘাতেই তার তিনটি মাথা কেটে ফেলল চাষির ছেলে ইভান।

আজব দানব চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়া বাপু চাষির ছেলে ইভান! আমায় একটু দম নিতে দে!'

'এখনই দম নেবার কী হল, আজব দানব! তোর তিনটে মাথা, আমার একটা। তোর যখন কেবল একটা মাথা থাকবে, তখন জিরিয়ে নেওয়া যাবে।'

আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, আঘাত করল।

আজব দানবের শেষ তিনটে মাথাও কেটে ফেলল চাষির ছেলে ইভান। তারপর তার লাশটা কেটে টুকরো-টুকরো করে স্মরোদিনা নদীতে ফেলে দিল, আর মাথা ছ'টা রাখল কালিনা সাঁকোর নিচে। তারপর ঘরে ফিরে শুয়ে ঘুমাতে গেল।

সকালে ফিরে এল বড় ভাই। ইভান তাকে জিজ্ঞেস করল,

'কিছুই চোখে পড়ে নি কাল?'

'ভাই, ধারেকাছে একটি মাছিও আসে নি!'

জবাবে একটি কথাও তাকে বলল না ইভান।

পরের দিন পাহারায় গেল মেজো ভাই। এদিকে গেল ওদিকে গেল, চারিপাশ দেখে নিশ্চিন্ত হল। তারপর ঝোপের ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার উপরও ভরসা করল না ইভান। রাত দু'প্রহর হতেই সে সাজসজ্জা শুরু করল, ধারালো তরোয়ালটি নিয়ে চলে গেল স্মরোদিনা নদীতে। কালিনা সাঁকোর নিচে লুকিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

হঠাৎ ফুঁসে উঠল নদীর জল, ওক গাছে চেঁচিয়ে উঠল ঈগল পাখি—এগিয়ে আসছে নয়মুণ্ডু আজব দানব। কালিনা সাঁকোর উপর আসতেই ঘোড়াটা তার হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ঝটপটিয়ে উঠল কাঁধের কালো দাঁড়কাক, শিউরে উঠল পিছনের কালো কুকুরটা...আজব দানবের চাবুক পড়ল ঘোড়ার গায়ে, কাকের পালকে, কুকুরের কানে।

'এ কী হুমড়ি খেলি কেন আমার ঘোড়া? ঝটপটিয়ে উঠলি কেন কালো দাঁড়কাক? শিউরে উঠলি কেন কালো কুকুর? নাকি তোরা ভেবেছিস, চাষির ছেলে ইভান এসে হাজির হয়েছে এখানে? ওর তো এখনো জন্মই হয় নি, জন্মালেও লড়বার যোগ্য হয় নি। ওকে আমি এক আঙুলেই খতম করে দেব!'

কালিনা সাঁকোর তল থেকে বেরিয়ে এল চাষির ছেলে ইভান।

'দাঁড়া রে আজব দানব, বড়াই করতে যাস না! কাজে নাম আগে। দেখব কে জেতে!

দামাস্কাস তরোয়ালের একে একে দুই কোপেই ছয়টি মুণ্ডু খসে গেল আজব দানবের। আর আজব দানবের ঘা খেয়ে ভেজা মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল ইভান। চাষির ছেলে ইভান তখন একমুঠো বালি নিয়ে ছুড়ে মারল সোজাসুজি আজব দানবের চোখে। আজব দানব চোখ মোছে আর মোছে, ওদিকে ইভান তার বাকি মুণ্ডুগুলো কেটে ফেলল। তারপর তার লাশটাকে টুকরো-টুকরো করে কেটে ছুড়ে ফেলল স্মরোদিনা নদীতে, আর ন'টা মুণ্ডু রাখল কালিনা সাঁকোর তলায়। নিজে সে ফিরে গেল কুটিরে। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল, যেন কিছুই হয় নি।

সকালে ফিরে এল মেজো ভাই।

ইভান বলল, 'তা রাতে কিছু চোখে পড়েছিল ভাই?'

'না তো। একটি মাছিকেও উড়তে দেখি নি, একটি মশাও গুন গুন করে নি!'

'বটে তাহলে এসো আমার সঙ্গে, মশা-মাছি দেখিয়ে দিই।'

ভাইদের নিয়ে ইভান গেল কালিনা সাঁকোর নিচে; আজব দানবের মাথাগুলো দেখাল।

বলল, 'দেখ কেমন মশা মাছি এখানে। তোমাদের বাপু ঘরে গিয়ে চুল্লির গরমে শুয়ে থাকাই ভালো, যুদ্ধ তোমাদের কর্ম নয়!'

লজ্জা হল ভাইদের।

বলল, 'ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে...'

তৃতীয় রাতে পাহারায় যাবার পালা ইভানের।

বলল, 'ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে চললাম আমি; তোমরা ভাই সারারাত ঘুমিয়ো না, কান পেতে রেখ। যেই আমার শিস শুনবে, অমনি আমার ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেবে আর নিজেরা আসবে সাহায্যে।'

চাষির ছেলে ইভান গেল স্মরোদিনা নদীর কাছে, অপেক্ষা করে রইল কালিনা সাঁকোর নিচে।

মাঝরাত পার হতেই দুলে উঠল ভেজা মাটি, ফুঁসে উঠল নদীর জল, পাক দিয়ে উঠল বাতাস, ওক গাছে চেঁচিয়ে উঠল ঈগল। এবার আসছে দ্বাদশমুণ্ডু আজব দানব। বারো মুণ্ডুই শিস দিচ্ছে, বারো মুখে আগুনের হলকা। আজব দানবের যে ঘোড়া তার

বারোটি পাখা, তামার লোম, লোহার লেজ, লোহার কেশর। কালিনা সাঁকোর উপর আসতেই ঘোড়া তার হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ঝটপটিয়ে উঠল কাঁধের দাঁড়কাক, শিউরে উঠল পিছনের কালো কুকুর। ঘোড়ার গায়ে, দাঁড়কাকের পালকে, কুকুরের কানের ওপর চাবুক মারল আজব দানব।

'কেন হুমড়ি খেয়ে পড়লি তুই, আমার ঘোড়া? কী দেখে ঝটপটিয়ে উঠলি দাঁড়কাক, কী জন্য শিউরে উঠলি কালো কুকুর? নাকি তোরা টের পেয়েছিস চাষির ছেলে ইভান এসেছে এখানে? তার তো জন্মই হয় নি, আর জন্ম যদিবা হয়ে থাকে লড়ার যোগ্য হয় নি। একবার নিঃশ্বাস ফেললেই ছাইটুকুও আর পড়ে থাকবে না!'

কালিনা সাঁকোর তল থেকে তখন বেরিয়ে এল চাষির ছেলে ইভান।

'দাঁড়ারে আজব দানব, বড়াই করিস না, সেধে নিজের মান খোয়াস না।'

'আরে তুই, চাষির ছেলে ইভান না কি? এখানে এসেছিস যে বড়?'

'এসেছি রাক্ষস তোর শক্তি দেখতে, সাহসের পরখ নিতে!'

'সাহসের পরখ নিবি আমার! আমার কাছে তো তুই একটা মাছি!'

আজব দানবকে বলল চাষির ছেলে ইভান,

'বাজে কথা শুনতে আসি নি, শোনাতে আসি নি। এসেছি মৃত্যুপণ লড়াইয়ে, দুরাত্মা তুই, তোর কবল থেকে ভালো মানুষদের বাঁচাতে!'

ইভান তার তরোয়ালের এক কোপে তিনটে মাথা কেটে ফেলল আজব দানবের। আজব দানব কিন্তু সে মাথা লুফে নিয়ে তার আগুনে-আঙুল বুলিয়ে বসিয়ে দিল কাঁধে, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে মাথাই জুড়ে গেল, যেন কিছুই হয় নি।

ইভানের হাল হল কাহিল : আজব দানবের শিসে ওর কানে তালা ধরে, আগুনে ছ্যাঁকা লাগে, ফুলকিতে গা জ্বলে যায়, সোঁদামাটিতে ডুবে যায় হাঁটু পর্যন্ত... আজব দানব উপহাস করে বলে,

'একটু জিরিয়ে নিবি নাকি, চাষির ছেলে ইভান?' 'জিরাব কী? লড়ো, মারো, নিজের কথা ভাবলে কি চলে?—এই আমাদের রীতি!'

শিস দিলে ইভান, ভাইয়েরা অপেক্ষা করে আছে কুটিরে, সেই কুটিরে ছুড়ে মারল তার ডান হাতের দস্তানা। তাতে জানালার কাচ সব ভেঙে পড়ল, কিন্তু ভাইরা ঘুমে অচেতন, কিছুই কানে যায় না।

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ইভান আবার আর এক কোপ বসাল; এটা আগের চেয়েও জোরে—ছয়মুণ্ডু কেটে ফেলল আজব দানবের। আজব দানব মুণ্ডুগুলোকে লুফে নিয়ে আগুনে-আঙুল বুলিয়ে বসিয়ে দিল ঘাড়ে—সবই আবার যে-কে সেই। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ইভানের উপর, ভেজা মাটিতে কোমর পর্যন্ত গেড়ে গেল ইভান।

ইভান দেখে, অবস্থা খারাপ। বাঁ হাতের দস্তানা খুলে ছুড়ে মারল কুটিরের দিকে। দস্তানার ঘায়ে ভেঙে পড়ল কুঁড়ের ছাদ, কিন্তু ভাইদের ঘুম আর ভাঙে না, কোনোকিছু কানে যায় না।

তৃতীয়বার কোপ বসাল চাষির ছেলে ইভান—নয়টা মুণ্ডু কেটে ফেলল আজব দানবের। আজব দানব সব মুণ্ডু লুফে নিয়ে আগুনে-আঙুল বুলিয়ে আবার বসিয়ে দিল

ঘাড়ে। মাথা জুড়ে গেল আবার। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইভানের উপর, ভেজা মাটিতে কাঁধ পর্যন্ত গেড়ে গেল ইভান...

মাথার টুপি খুলে তখন ছুড়ে মারল ইভান। সে আঘাতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল কুঁড়ে; দেয়াল ভেঙে পড়ে আর কি! তখন ঘুম ভাঙল ভাইদের, শোনে ইভানের ঘোড়া ডাক ছাড়ছে, কড়মড়িয়ে কামড় দিচ্ছে শিকলে।

ছুটে গিয়ে ঘোড়া খুলে দিল তারা, নিজেরা এল পিছন পিছন।

ইভানের ঘোড়া ছুটে এসে চাঁটি মারতে লাগল আজব দানবকে। শিস দিল আজব দানব, হিসিয়ে উঠল, ফুলকি ছড়াতে লাগল ঘোড়ার গায়ে।

আর সেই অবসরে মাটি থেকে উঠে এল চাষির ছেলে ইভান, কেটে ফেলল আজব দানবের আগুন-আঙুল। তারপর লাগাও কোপ মাথায়! একটি মাথাও বাকি রইল না। লাশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দিল স্মরোদিনা নদীতে।

ততক্ষণে ছুটে এসেছে ভাইরা।

ইভান বলল, ছি! ছি! তোদের ঘুমের জন্য আমার মাথাটি খোয়াতে বসেছিলাম!'

ভাইরা তাকে নিয়ে এল কুটিরে, ধোয়াল মোছাল, বিছানায় শুইয়ে দিল।

রাত ভোর হতেই সাজসজ্জা শুরু করল ইভান।

'সাতসকালে চললি কোথায়? ভাইরা বলল, অমন লড়াইয়ের পর একটু গড়িয়ে নে।'

ইভান বলে, 'না, গড়িয়ে নেবার সময় নেই আমার। স্মরোদিনা নদীতে চললাম, কোমরবন্ধটা হারিয়ে বসেছি খুঁজে দেখি গে।'

'কী দরকার! ভাইরা বলে' 'শহরে যাব, নতুন কিনে নিস।'

'উঃ' আমার নিজেরটাই আমার চাই!'

ইভান গেল স্মরোদিনা নদীতে, কিন্তু কোমরবন্ধ না খুঁজে কালিনা সাঁকো বেয়ে চলে গেল অপর পারে; চুপিচুপি গিয়ে হাজির হল আজব দানবের পাষাণপুরীতে। খোলা জানালার কাছে গিয়ে কান পাতল; কেউ এখানে ফন্দি-ফিকির আঁটছে না তো?

দেখে কী—বসে আছে আজব দানবের তিন বৌ আর মা, বুড়ি নাগিনী। বসে বসে আলাপ করছে।

প্রথম বৌ বলে,

'আমার স্বামীর হয়ে প্রতিশোধ নেব চাষির ছেলে ইভানের উপর। ইভান আর তার ভাইরা যখন বাড়ি ফিরবে তখন ওদের আগে আগে ছুটে যাব আমি, গরম ছাড়ব চারিদিকে আর নিজে একটা কুয়ার রূপ ধরব। জল খেতে চাইবে ওরা আর প্রথম ঢোকেই মরণে ঢলে পড়বে।'

'এটা বেশ ফন্দি করেছিস তুই!' বলে বুড়ি নাগিনী।

দ্বিতীয় বউ বলে,

'আর আমি আগে আগে গিয়ে একটা আপেল গাছের রূপ ধরব। এক-একটা করে আপেল খাবে আর অমনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে সবাই।'

'এটা বেশ ফন্দি করেছিস তুই!' বলে বুড়ি নাগিনী।

তৃতীয় বৌ বলে :

'আর আমি ওদের উপর ঘুম আর ঢুলুনি ছেড়ে দেব, নিজে এগিয়ে গিয়ে হয়ে দাঁড়াব একটা তুলতুলে গালিচা, তাতে রেশমি বালিশ। একটু শুয়ে গড়িয়ে নেবার ইচ্ছে হবে ভাইদের—অমনি পুড়ে মারব আগুনে।'

'এটা বেশ ফন্দি করেছিস তুই!' বলল নাগিনী, 'আর তোরা যদি ওদের মারতে না পারিস তাহলে আমি নিজে হব একটা মস্ত শুয়োর, তেড়ে গিয়ে ওদের সবকটাকে গিলে খাব।'

এইসব কথা শুনেটুনে ভাইদের কাছে ফিরে এল চাষির ছেলে ইভান।

ভাইরা জিজ্ঞেস করে, 'কী রে, পেয়েছিস তোর কোমরবন্ধ?'

'পেয়েছি।' 'তার জন্য এত সময় নষ্ট করা সাজে?'

'সাজে বৈকি!'

তারপর গোছগাছ করে সবাই রওনা দিল বাড়ির দিকে।

চলল তারা তেপান্তর পেরিয়ে, চলল ডাঙা পেরিয়ে। গরমে প্রাণ আই-ঢাই। ভয়ানক তেষ্টা—ধৈর্য আর ধরে না! হঠাৎ ভাইরা দেখে কী—এক কুয়ো। কুয়োর জলে ভাসছে রুপোর কলস। ইভানকে তারা বলল, 'আয় ভাই, একটু থামি। ঠাণ্ডাজল নিজেরা খাব, ঘোড়াকে খাওয়াব।'

'কে জানে এ কুয়োর জল কী রকম', ইভান বলল, 'হয়তবা পচা, নোংরা।'

আবার ঘোড়া থেকে নেমে এসে তরোয়াল দিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল কুয়োটাকে। গঙিয়ে উঠল কুয়ো, কঁকিয়ে উঠল আর্তনাদ করে...অমনি কুয়াশা নেমে এল, গরম কেটে গেল, তেষ্টা আর পেল না।

ইভান বলল, 'দেখলে তো কুয়োর জল কেমন?'

আরো এগিয়ে গেল ওরা।

গেল অনেক পথ নাকি অল্প পথ, কে জানে। দেখে কী—এক আপেল গাছ। তাতে বড় বড় লাল লাল আপেল।

ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে গেল ভাইরা, ভেবেছিল আপেল পেড়ে খাবে। ইভান কিন্তু আগে আগে ছুটে গিয়ে এক ঘায়ে আপেল গাছের শিকড়সমেত কেটে ফেলল। গঁঙিয়ে উঠল আপেলগাছ, কঁকিয়ে উঠল...

'দেখলে তো ভাইরা, কেমন আপেল গাছ। এ আপেল বড়ই কটু!'

ঘোড়ায় উঠে আবার এগিয়ে চলল [illegible]

যায় যায়, আর ভয়ানক [illegible] লাগে। দেখে [illegible] গাছের মধ্যে পাতা আছে এক রঙিন তুলতুলে গালিচা, তার [illegible] পালকের [illegible]

ভাইরা বলে, 'চল এ[illegible] পড়িয়ে নিই [illegible] দণ্ড ঘুমিয়ে নিই!'

'না ভাই, এ গালিচা [illegible]বার মতো নরম নয়', উত্তর দিল ইভান।

ভাইরা চটে উঠল,

'খুব যে শেখাতে এসেছিস আমাদের—এটা চলবে না, সেটা চলবে না!'

জবাবে একটি কথাও বলল না ইভান। নিজের কটিবন্ধটা খুলে সে ছুড়ে দিল গালিচায়। কটিবন্ধটা দপ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে গেল।

'তোমাদেরও ঐ দশা হতো', ভাইদের বলল ইভান।

তারপর গালিচার কাছে গিয়ে, মারো বাড়ি তরোয়াল দিয়ে! গালিচা-বালিশ কেটে কুচিকুচি করে ঠেলে দিয়ে ইভান বলল,

'খামোকা আমায় বকাবকি করলে, ভাইরা! কুয়ো, আপেল, আর গালিচা—এ সবই যে হল আজব দানবের বউ। ভেবেছিল আমাদের মারবে, কিন্তু হল না, মরল নিজেরাই।'

আরো এগিয়ে গেল ভাইরা।

গেল অল্পপথ নাকি অনেক পথ, কে জানে; হঠাৎ আঁধার হয়ে এল আকাশ, গঁঙিয়ে উঠল বাতাস, গুরুগুরু করে উঠল মাটি। ওদের দিকে ধেয়ে এল মস্ত এক শুয়োর। আকর্ণমুখ হাঁ করল সে—গিলে খায় আর কী ইভান আর তার ভাইদের! কিন্তু সাবাশ! বুদ্ধি আছে বটে! থলে থেকে সেরকয়েক করে পথখোরাকি নুন বের করে তারা ছুড়ে মারল শুয়োরের হাঁ-এর মধ্যে।

শুয়োরের আনন্দ আর ধরে না, ভাবল চাষির ছেলে ইভান আর তার ভাইদের ধরে ফেলেছে। তাই দৌড় থামিয়ে সে নুন চাটতে লাগল। কিন্তু যেই বুঝল নুন অমনি আবার ছুটে গেল তাড়া করে।

ছুটছে শুয়োর, খাড়া হয়ে উঠেছে লোম, কড়মড় করছে দাঁত। এই বুঝি ধরে ধরে...

অমনি ইভান বলল, তিন ভাই তিন দিকে চলে যাক। একজন ছুটল ডাইনে, একজন বাঁয়ে আর ইভান নিজে—সামনে।

ছুটতে গিয়ে থেমে গেল শুয়োর—বুঝতে পারল না কাকে আগে ধরবে। ও যতক্ষণ ভাবছে আর চারদিকে মাথা ঘোরাচ্ছে, ততক্ষণে ইভান তার দিকে ধেয়ে এসে প্রাণপণে তাকে শূন্যে তুলে ধরে দিল এক আছাড়। শুয়োর হয়ে গেল ধুলো, আর সে ধুলো উড়ে গেল বাতাসে।

সেই থেকে সে দেশে আর কখনো কোনো আজব দানব কি নাগিনী দেখা যায় নি।—নির্ভয়ে দিন কাটাতে শুরু করে লোকেরা।

আর চাষির ছেলে ইভান তার ভাইদের সঙ্গে ফিরে এল ঘরে, এল বাপের কাছে মায়ের কাছে। সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটে তাদের, হাল দেয়, লাঙল দেয়, বীজ বোনে, ফসল তোলে।